পৃথিবীর বড় মানুষ

গোপাল ভৌমিক এম. এ.

প্রাপ্তিস্থান
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার
কলিকাতা

দাম পাঁচ সিকা মাত্র.

প্রকাশক :
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বি. এ.
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৫৩

মুদ্রাকর :
শ্রীরসিকলাল পান
গোবর্দ্ধন প্রেস
২০৯ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র চার বৎসরের মধ্যে কোন বাংলা প্রবন্ধের বইয়ের চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার। পাঠক পাঠিকাদের কৃপায় 'পৃথিবীর বড় মানুষে'র ভাগ্যে এই বিস্ময়কর ব্যাপারই ঘটেছে। সুতরাং এ বইয়ের লেখক হিসাবে কিঞ্চিৎ আত্ম-সন্তুষ্টি লাভের অধিকার বোধ হয় আমার আছে।

প্রায় প্রত্যেক সংস্করণেই এ বইয়ে কিছুটা রদ-বদল করে একে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তোলার প্রয়াস পেয়েছি। চতুর্থ সংস্করণেও তুর্কী বীর কামাল আতাতুর্কের জীবনী সংযোজনা করে একে অধিকতর লোভ-নীয় করে তোলার প্রয়াস পেলাম। স্বদেশপ্রেমিক কামালের বৈচিত্র্যময় জীবনী থেকে আমাদের দেশের ভাবী নেতা ও নেত্রীরা অনেক চিন্তার খোরাক এবং নিজেদের চরিত্র গড়ে তোলার উপাদান পাবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।

'পৃথিবীর বড় মানুষ' আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান। এদিক থেকে বইটির উপর আমার কিছুটা স্নেহান্ধ দুর্বলতা আছে। যাঁদের অকৃত্রিম সাহায্য ও সহানুভূতি আমাকে এই পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করেছিল এই প্রসঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁদের কথা স্মরণ করি। তাঁদের মধ্যে আবার চার জন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। তাঁরা হচ্ছেন সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু এবং শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার মিত্র। আর আমার এই পুস্তক প্রকাশের সুযোগ দিয়ে বাধিত করেছিলেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বি. এ.। এঁদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলিকাতা
১লা অগ্রহায়ণ ১৩৫২।

গোপাল ভৌমিক

সূচী

সক্রেটিস্

ইউরোপের গ্রীস্ দেশের নাম তোমরা অনেকই হয় ত শুনেছ। চীন, ভারতবর্ষ এবং মিশরের সভ্যতার মত এই গ্রীস্ দেশের সভ্যতাও অতি প্রাচীন। গ্রীস্ দেশটি কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের শত শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সুসভ্য ইংলণ্ডের আদিম অধিবাসীরা ছিল অসভ্য—তারা পর্ব্বতের গুহায় বাস কর্‌ত আর জীব-জন্তুর চামড়া পরিধান ক'রে লজ্জা নিবারণ কর্‌ত। ইউরোপের প্রায় সব দেশই যখন অসভ্যতা আর অজ্ঞানের তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তখন এই রৌদ্রদীপ্ত পর্ব্বতসঙ্কুল ছোট্ট গ্রীস্ দেশটি এক অত্যাশ্চর্য্য সভ্যতার জন্মভূমি ব'লে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

অনেক শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, স্থপতি, ভাস্কর প্রভৃতি তখন এই সাগরবেষ্টিত ছোট দেশটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সুসভ্য প্রাচীন গ্রীক্ জাতির কাছে বর্ত্তমানের ইউরোপীয় সভ্যতা বহু প্রকারে ঋণী। প্রাচীন গ্রীক্ মনীষীদের বহু কীর্ত্তিকলাপই আজ কালের অমোঘ বিধানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সর্ব্বধ্বংসী কালের হাত এড়িয়ে তাদের সভ্যতার যতটুকু নিদর্শন আমাদের কাছে এসে পৌঁছেচে, তাতেই আমাদের বিস্মিত হয়ে যেতে হয়।

সক্রেটিস্

এই সব প্রাচীন গ্রীক্ মনীষী-দের নাম তোমরা অনেক শুনবে বা পড়বে, কিন্তু তাঁদের বই পড়বার সৌভাগ্য হয় ত তোমাদের নাও হতে পারে। তবু যাঁদের নাম পৃথিবীতে আজ দুহাজার বৎসরের বেশী দিন ধরে বেঁচে আছে তাঁদের জীবন সম্বন্ধে দুচার কথা জানা সৌভাগ্যের বিষয় নয় কি?

পূর্ব্বেই বলেছি প্রাচীন গ্রীস্ দেশে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে মহাপুরুষের কথা তোমাদের কাছে বলব, তাঁর নাম সক্রেটিস্। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪৬৯ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস্

দেশের এথেন্স্ (Athens) নগরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি ছিলেন তৎকালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁর মৃত্যুর আড়াই হাজার বছর পরে আজও তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মানব-গুরু ব'লে বিবেচিত হন।

তোমরা সহজেই বুঝতে পার্‌ছ যে, এই আড়াই হাজার বৎসর পরে সক্রেটিসের বাল্যকাল এবং যৌবন সম্বন্ধে বেশী কথা জানতে পারা কি সুকঠিন! তবে একথা জানা গেছে যে সক্রেটিসের পিতা ছিলেন ভাস্কর (Sculptor) আর সক্রেটিস্ বাল্যকালে তাঁর পিতাকেই হয় ত ভাস্কর্য্যকার্য্যে সাহায্য কর্‌তেন।

সে সময় এথেন্স্ নগরী ভাস্কর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এথেন্সের তখন মহা সমৃদ্ধির সময়। বহু কবি, শিল্পী, ঐতিহাসিক তখন এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এমনই সময় সক্রেটিসের জন্ম হয়। তিনি বাল্যে সঙ্গীত, বাগ্মিতা, অঙ্ক, ব্যায়াম প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। পরে তিনি এথেন্সের সৈন্যদলে প্রবেশ করেন এবং নিজের সৎসাহস এবং কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এর কিছুদিন পরে তিনি একটি রাজকার্য্য লাভ করেন—কিন্তু এ কার্য্য করার সৌভাগ্য তাঁর বেশীদিন হয় নি। তিনি স্বভাবতঃই স্বাধীন-চেতা এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। রাজকার্য্যের নজিরে তাঁকে এক অন্যায় আদেশ করাতে তিনি তা পালন কর্‌তে রাজী হন নি। এই অবাধ্যতার ফলে তাঁর চাকরী যায়—আর তাঁর নিজের জীবনও অনেকটা বিপন্ন হয়ে ওঠে।

প্রথম থেকেই সক্রেটিস্ অত্যন্ত সরল বাঁধাধরা নিয়মিত জীবন যাপন কর্‌তেন। তাঁর অভাব ছিল খুবই সামান্য। বাজার দিয়ে চলবার সময় রাস্তার দুপাশে সাজানো জিনিষ-পত্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠতেন—“এসব কত জিনিষ ছাড়াই ত আমার জীবন চলে!” এথেন্সে সে সময় মাঝে মাঝে প্লেগের মহামারী দেখা দিত, কিন্তু তাঁর এই সাদাসিধে নিয়মিত জীবনযাপনের ফলে তিনি কোনবারই প্লেগে আক্রান্ত হন্‌নি। সত্যের সন্ধানই ছিল তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সরল জীবনযাপনের ফলে তাঁর খুব কম অর্থের দরকার হ'ত ব'লে তিনি সত্যের সন্ধানে খুব বেশী সময় ব্যয় কর্‌তে পার্‌তেন। তিনি ছিলেন বড় ন্যায়ধর্ম্মী দার্শনিক অর্থাৎ তিনি মানবজীবনের সমস্যাগুলি পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তেন আর এইসব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতেন।

আমরা কেন কতকগুলো কাজ করি—কেন আমরা বিশেষ উপায়ে চিন্তা করি—এই সব সমস্যা তিনি আলোচনা করতেন এবং সত্য, ন্যায়, সাধুতা প্রভৃতি গুণগুলির অর্থ মানুষদের বোঝানোর চেষ্টা কর্‌তেন। এই সব কথাগুলো এমনি খুব সোজা মনে হয় কিন্তু এদের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন।

খোলা জায়গায় অথবা বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে সক্রেটিস্ এই সব বিষয় আলোচনা কর্‌তেন। দলে দলে লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুন্‌ত। তিনি নিজের অজ্ঞতার কথা সর্ব্বসমক্ষে অসঙ্কোচে প্রকাশ কর্‌তেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় রাজপুরুষ এবং অন্যান্য অনেক চালবাজ দার্শনিকেরও অজ্ঞতা

এবং মূর্খতা দেশবাসীদের কাছে প্রকাশ ক'রে দিতেন। এর ফলে তিনি অনেক রাজপুরুষের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন।

পক্ষান্তরে তাঁর এই নিঃসঙ্কোচ সত্যভাষণের ফলে তাঁর বহু শিষ্য জুটতে থাকে। সক্রেটিস্ দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত ছিলেন—তাঁর নাক ছিল খাঁদা—আর চোখগুলো ছিল ড্যাব্ ড্যাবে ভাসা ভাসা। প্রাচীন গ্রীক্‌রা ছিল অত্যন্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয় জাতি। কিন্তু তাঁরাও এই কুৎসিত মানুষটির মানসিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না হয়ে পারেননি। বিশেষ ক'রে যুবকরা এই দার্শনিকের প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়্‌ল। সক্রেটিস্ শিষ্যদের শিক্ষাদান ক'রে খুব আনন্দ পেতেন। আর শিষ্যরাও তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌ত। এদের মধ্যে একজন শিষ্য বলেছিলেন, "তাঁর চরিত্র এত মধুময় এবং স্বর্গীয় যে, তিনি যা আদেশ করেন তা ঈশ্বরের আদেশের মত। প্রত্যেককে তাঁর আদেশ মানতেই হবে।"

এ রকম নির্ভীক, সত্যদ্রষ্টা যে সব মহাপুরুষ, রাজপুরুষরা তাঁদের কক্ষণো ভাল চোখে দেখতে পারেন না। তাই এথেন্সের কর্ত্তৃপক্ষও সক্রেটিসের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে এলেন। এই বলে অভিযোগ করা হ'ল যে সক্রেটিস্ এথেন্স সহরের যুবকদের অধঃপাতের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। সক্রেটিসের বিচার হ'ল। বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন—তাঁর মৃত্যুদণ্ড হ'ল। তাঁকে ফাঁসি দিয়ে মারা হবে না, বিষ খাইয়ে মারা হবে।

মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সক্রেটিস্ কারাগারে বদ্ধ রইলেন। মৃত্যুর দিন এল। বন্ধুশিষ্যপরিবেষ্টিত হয়ে সক্রেটিস্ কারাগারে

বসেছিলেন। সকলেরই মুখে আসন্ন বিপদের ছায়া ও উদ্বেগের চিহ্ন। একমাত্র সক্রেটিসের মুখেই কোন উদ্বেগের চিহ্ন নাই, তিনি পূর্ব্বের মতই সহাস্য এবং প্রফুল্ল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, সূর্য্য যখন পশ্চিমে পাহাড়গুলোর পিছনে ঢলে পড়েছে, তখন কারারক্ষী এক পেয়ালা হেমলকের (Hemlock) বিষ নিয়ে এল। সক্রেটিস্ ধীরভাবে রক্ষীর হাত থেকে পেয়ালাটি নিয়ে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিরুদ্বেগে কথা বল্‌তে বল্‌তে প্রফুল্লচিত্তে সমস্তটা বিষ নিঃশেষে পান কর্‌লেন।

তাঁর শিষ্য এবং বন্ধুরা ভেঙ্গে পড়্‌লেন এবং সকলে শিশুর মত চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু ধীর সক্রেটিসের মুখে কোন কাতরোক্তি নেই; তিনি তাঁদের শান্ত হ'তে আদেশ ক'রে বল্‌লেন—"আমার প্রস্থানের সময় হয়েছে। পৃথিবীতে আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথে চলি। ভগবানের বিধান অলঙ্ঘ্য—আমাকে মর্‌তে হ'ল, তোমরা বেঁচে থাকো। একমাত্র ভগবানই জানেন—বেঁচে থাকা ভাল না ম'রে যাওয়া ভাল।" ধীরে ধীরে তাঁর দেহ অসাড় হয়ে এল। এমনি ক'রে একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের মৃত্যু হ'ল। কিন্তু মর্‌বার সময়ও তাঁর মুখে ভয় বা কাতরতার চিহ্ন প্রকাশ পায়নি। তিনি জীবনে যেমন নির্ভীক ছিলেন, মৃত্যুকেও তেমনি নির্ভীক ভাবে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন।

সক্রেটিস্ তাঁর উপদেশাবলী কিছুই নিজে লিখে রেখে যাননি। প্লেটো আর জেনোফোন ব'লে তাঁর দুই শিষ্য তাঁর কিছু কিছু উপদেশ আমাদের জন্য রক্ষা ক'রে গেছেন।

"নিজেকে জানো" (Know thyself) এই ছিল সক্রেটিসের মূলমন্ত্র। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রও বলে—"আত্মানং বিদ্ধি।" সত্যি, নিজেকে জানার চেয়ে বড় জ্ঞান বোধ হয় আর নেই। সক্রেটিস্ আর একটি জিনিষের উপর জোর দিতেন। তিনি বলতেন যে জ্ঞান থেকেই ধর্ম্ম এবং সততা প্রভৃতি গুণ জন্মে; আর অজ্ঞতা থেকে যত কিছু পাপ এবং অন্যায় জন্মে। কাজেই তিনি অজ্ঞতা দূর করবার জন্য জ্ঞানার্জ্জনের উপদেশ দিতেন। আজ প্রায় দুহাজার বৎসর পরে পৃথিবীর পণ্ডিতেরা সক্রেটিসের কথা যে সত্য তা বুঝতে পেরেছেন।

এথেন্স্‌বাসীরাও কিছুদিন পরে নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু তারা তাদের জ্ঞানী দার্শনিককে আর বাঁচাতে পারল না। তারা সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের মধ্যে একজনকে করল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আর দুজনকে দিল নির্ব্বাসন। তারপর তারা মৃত মনীষীর স্মৃতি অমর করবার জন্য সক্রেটিসের ব্রোঞ্জ্ মূর্ত্তি স্থাপন করল এথেন্স নগরীর মধ্যে। সক্রেটিসের নশ্বর দেহের মৃত্যু হয়েছে বটে কিন্তু তাঁর অমর কীর্ত্তি চিরদিন জগতে বেঁচে থাকবে।

এ্যারিষ্টোট্‌ল্‌

বর্ত্তমান প্রবন্ধে যাঁর জীবন-কথা আলোচনা কর্‌ব তিনি প্রাচীন গ্রীসের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁর নাম এ্যারিষ্টোট্‌ল্‌ (Aristotle)। তিনি ছিলেন সক্রেটিসের পরবর্ত্তী।

মহামনীষী এ্যারিষ্টোট্‌ল্‌
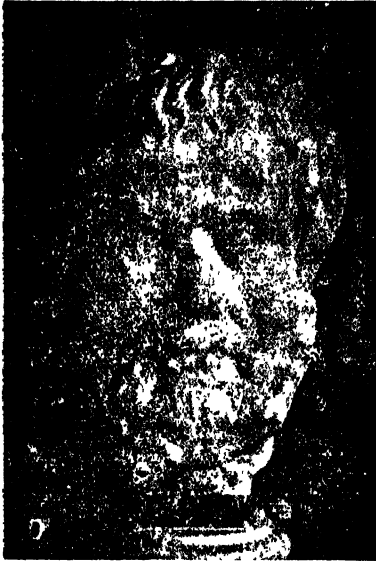
সক্রেটিসের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরের একটি সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্ণ। এমনি একদিন এথেন্সের বাজারের মধ্যে ছিপছিপে সুদর্শন একটি আঠারো বছরের যুবক ধীরে ধীরে রাজপথে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি এথেন্স্‌ সহরে নবাগত; তাঁর পোষাক ভদ্র যুবকের উপযুক্ত হলেও এথেন্স্‌বাসী যুবকদের পোষাকের মত কেতাদুরস্ত ছিল না। রাস্তার সকলেই ব্যাকুল ঔৎসুক্য নিয়ে এই নবাগত যুবকটিকে দেখছিল। অবশেষে যুবকটি সাহস সঞ্চয় করে

একজন এথেন্সবাসীকে প্রশ্ন করলেন: "আপনি কি দয়া ক'রে আমাকে দার্শনিক প্লেটোর (Plato) বাড়ীটি দেখিয়ে দেবেন ?" তাঁর এই প্রশ্ন শুনে সকলেই নিঃসন্দেহ হ'ল যে তিনি কখনও এথেন্সবাসী নন। কারণ সক্রেটিসের শিষ্য, প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত প্লেটোর বাড়ী চিন্‌ত না, এমন লোক তখন এথেন্সে ছিল না। এথেন্সবাসী লোকটি অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল: "তুমি কোন্ অসভ্য দেশের অধিবাসী হে ? তুমি কি জানো না যে দার্শনিক প্লেটো গত কয়েক মাস যাবৎ সমুদ্রপারে আছেন ?" নবাগত যুবকটি উত্তর দিলেন: "আমি ম্যাসিডোনিয়ার Macedonia) রাজ-বৈদ্য নিকোম্যাকাসের (Nicomachus) পুত্র এ্যারিষ্টোট্‌ল্। আমি প্লেটোর কাছে দর্শন শিক্ষা করতে ষ্ট্যাজিরা (Stagura) থেকে এথেন্সে এসেছি।" এথেন্সবাসী লোকটি উত্তর দিলে: "বেশ, কিন্তু শিক্ষক ত বর্ত্তমানে অনুপস্থিত" এই ব'লে সে এ্যারিষ্টোট্‌ল্‌কে সঙ্গে নিয়ে প্লেটোর দেয়াল-ঘেরা বাগান-বাড়িটি দেখিয়ে দিলে। এইখানে মহাপণ্ডিত প্লেটো নানাদেশ থেকে সমাগত তাঁর শিষ্যবৃন্দকে দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।

তিন বছর ধ'রে প্লেটো সাগরপারে রইলেন! কিন্তু তোমরা মনে করো না যে গুরুকে না পেয়ে এ্যারিষ্টোট্‌ল্ এই সময়টা বৃথাই ব্যয় করলেন! তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের ধনীর ছেলেই ছিলেন, তবুও তিনি এথেন্সের আরামপ্রিয় ধনী যুবকদের সঙ্গে মিশে বৃথা আমোদ প্রমোদে সময়-ক্ষেপ করতেন না। তিনি একটা বাড়ী কিনে সেখানে একটা লাইব্রেরী সংগ্রহ

করতে লাগলেন। আর এথেন্সের যে সব পণ্ডিত জ্ঞানার্জ্জনের জন্য জীবন-পাত করছিলেন, তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন।

তাঁর জ্ঞান-তৃষ্ণা এত প্রবল ছিল যে, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য অনেক সময় তিনি ঘুম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতেন। এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। যখন তিনি বিশ্রামের জন্য শয়ন করতেন, তখনও তাঁর ইচ্ছা হ'ত তিনি আরও পড়েন। সেজন্য তিনি শয্যাপার্শ্বে একটি পিতলের পাত্র রাখতেন। আর নিজের হাতে এক টুকরো সীসা রেখে হাতটা পাত্রের উপর ধ'রে রাখতেন। যখন ঘুম পেত তখনই সীসা-খণ্ডটি তাঁর হাত থেকে পিতলের পাত্রে পড়ে ঝন্ ঝন্ ক'রে উঠত। আর তার ফলে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যেত। এমনি ছিল তাঁর অদম্য জ্ঞান-পিপাসা।

প্লেটো ফিরে এসে তাঁর নূতন শিষ্যটিকে দেখে খুব খুসী হলেন। প্লেটো দর্শনমাত্র তাঁকে ভালবাসলেন। তারপর প্লেটোর মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ বছর ধ'রে গুরুশিষ্য একসঙ্গে কাজ করতে লাগলেন।

প্লেটোর মৃত্যুর পর এ্যারিষ্টোট্‌ল্ স্বদেশ ম্যাসিডোনিয়ায় ফিরে গেলেন। ম্যাসিডোনিয়ার রাজপুত্র আলেক্‌জাণ্ডারের (Alexander) শিক্ষার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হ'ল। এই আলেক্‌জাণ্ডারই পরে বিশ্ববিজয়ী মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার হয়েছিলেন। এঁর কথা তোমরা ইতিহাসে পড়েছ। বারো বছর ধ'রে এ্যারিষ্টোট্‌ল্ আলেক্‌জাণ্ডারকে শিক্ষা দিলেন।

তাঁর শিক্ষার ফলে রাজপুত্র সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হলেন। এর ফল দেখা গিয়েছিল তিনি যখন তাঁর বিজয়বাহিনী নিয়ে এথেন্স দখল করেছিলেন। এথেন্স দখলের পর তিনি সহরের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, সুন্দর সুন্দর মর্ম্মর মূর্ত্তি ও বহু মূল্যবান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। তিনি যদি এ্যারিষ্টোটলের সুশিক্ষায় শিক্ষিত না হতেন, তবে হয় ত তাঁর অসভ্য সৈন্যদল নিয়ে এ সব ধ্বংস ক'রে ফেলতেন।

আলেকজাণ্ডার গুরুর কাছে তাঁর ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন। তিনি বলতেন: "পিতার কাছে আমি আমার জীবনের জন্য ঋণী; কিন্তু কেমন ক'রে ভালভাবে বেঁচে থাকতে হয়, এ জ্ঞানের জন্য আমি সম্পূর্ণ ঋণী আমার গুরু এ্যারিষ্টোটলের কাছে।"

আলেকজাণ্ডারের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করার পর এ্যারিষ্টোটল্ এথেন্স ফিরে গেলেন। তিনি এথেন্সের লাইসিয়াম্ (Lyceum) নামক স্থানে তাঁর বিদ্যামন্দির স্থাপন করলেন। সে সময়ের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত এসে তাঁর বিদ্যা-মন্দিরে অধ্যাপনা কার্য্যে যোগ দিলেন। পরবর্ত্তী বারো বৎসর তিনি সেখানে নানা বিষয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। এই সব গবেষণার ফলে তাঁর মৃত্যুর ১৮০০ বছর পরে আজও তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব'লে বিবেচিত হন!

কিন্তু প্রাচীন এথেন্সবাসীরা ছিল বড় ঈর্ষ্যা-পরায়ণ।

শীঘ্রই তারা এ্যারিষ্টোট্‌লের প্রতিপত্তি দেখে তাঁকে ঈর্ষ্যার চোখে দেখতে লাগল। ফলে সক্রেটিসের মত তাঁর বিরুদ্ধেও তারা মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে এল। অভিযোগে বলা হ'ল যে এ্যারিষ্টোট্‌ল্ এথেন্সের উপাস্য দেবদেবীর নিন্দা করেন এবং যুবকদের অধঃপাতের পথে নিয়ে যান। এ্যারিষ্টোট্‌ল্ এথেন্স ছেড়ে পালিয়ে গেলেন; পর বৎসর বিদেশেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। কিন্তু তাঁর কার্য্য চিরকাল পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর ছাত্র আলেক্‌জাণ্ডার অস্ত্রবলে জগৎ জয় করেছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় জ্ঞান-বলে পৃথিবী জয় করেছেন।

হেলেন কেলার্

মূক বধির এবং অন্ধরাও যে আজকাল লেখাপড়া শিখে উন্নতি করতে পারে তা তোমরা বোধ হয় সবাই জান। তোমাদের কাছে আজ আর এটা বিস্ময়জনক ব'লে বোধ হয় না—অথচ এমন একদিন ছিল, যখন এদের মানুষ ক'রে তোলা ছিল একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা। মহাত্মা লুই ব্রেলের আবিষ্কৃত বর্ণমালার সাহায্যে আজ অন্ধদের শিক্ষাদান করা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে কৃতী অন্ধ ছাত্র শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়ের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান—এই ত সেদিন তিনি আমেরিকা থেকে অন্ধদের শিক্ষা-বিষয়ক গবেষণায় উচ্চ উপাধি নিয়ে ফিরে এলেন। আজ তোমাদের

হেলেন কেলার

কাছে আমেরিকার একটি মূক, বধির এবং অন্ধ মেয়ের কাহিনী বলব। তাঁর নাম হেলেন কেলার্ (Holen Keller)। তাঁর কাহিনী শুন্‌লে বুঝতে পার্‌বে তাঁকে শিক্ষা দিতে তাঁর বাপ-মাকে কি কষ্ট পেতে হয়েছিল।

হেলেনের যখন মাত্র আঠারো মাস বয়স তখন তিনি কঠিন অসুখে পড়েন। অসুখ থেকে তিনি বেঁচে উঠলেন বটে কিন্তু এই অসুখের ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং বাক্‌শক্তি—এই তিনটিই হারালেন। কাজেই যে-বয়সে ছেলেমেয়েরা সবেমাত্র পৃথিবীর সব জিনিষের নাম শিখতে সুরু করে, কথা বল্‌তে শেখে, সেই বয়স থেকেই হতভাগিনী হেলেন্ নীরব অন্ধকারে নিজের মধ্যে নিজে বন্দী হয়ে রইলেন।

তিনি অবাধে ঘরের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া কর্‌তেন এবং যখন কিছু দরকার হ'ত, তখন অতি সহজ কয়েকটি ইঙ্গিতের দ্বারা মাকে তাঁর অভাব জানিয়ে দিতেন। আর মার যদি কোন কথা বুঝতে দেরী হ'ত কিংবা তিনি সে জিনিষটা তাঁকে না দিতেন, তবে হেলেন অসম্ভব রেগে যেতেন।

তিনি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগ্‌লেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মপ্রকাশের এবং লোকের কাছে তাঁর অভাব অভিযোগ জানানোর ইচ্ছাও প্রবল হতে লাগ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাগ এবং অবাধ্যতাও বেড়ে চল্‌ল। তাঁর বাপ-মা এই অবাধ্য মেয়েকে নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়লেন। এর শিক্ষাদীক্ষার তাঁরা কি উপায় করেন? অবশেষে তাঁরা হেলেনের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত কর্‌লেন—তাঁর নাম শ্রীমতী এ্যান্

সুলিভ্যান্। এই ভদ্রমহিলাও তাঁর চোখ হারিয়ে ছয় বছর একটি অন্ধ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তিনি আংশিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। হেলেনের বাপ-মা যখন শিক্ষয়িত্রীর জন্য এই বিদ্যালয়ে দরখাস্ত করলেন, তখন কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীমতী সুলিভ্যান্‌কে পাঠিয়ে দিলেন। এই রাগী প্রকৃতির মেয়েটিকে নিয়ে প্রথম প্রথম শ্রীমতী সুলিভ্যান্‌কে কি কষ্টই না পেতে হয়েছিল! হেলেন্ চাম্‌চে ব্যবহার না ক'রে আঙ্গুল দিয়ে খাবার খাবেন—খাবারের থালা নিজের কাছে টেনে নেবেন—চাম্‌চে দেবেন মাটিতে ফেলে। প্রতিবাদ ক'রে কেউ কিছু বললে অমনি মেঝেয় শুয়ে কাঁদা আর হাত-পা ছোড়া হবে। ছয় বছরের ছোট মেয়ে হেলেন্ কারও আদেশ পালন কর্‌তে শেখেন নি—কারণ হেলেনের দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁর বাপ-মা কখনও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতেন না। শ্রীমতী সুলিভ্যান্ বুঝতে পারলেন যে ওকে বাধ্য কর্‌তে না পার্‌লে ওর দ্বারা কোন কাজ হবে না।

শিক্ষয়িত্রীর ভালবাসা এবং ধৈর্য্যের গুণ শীঘ্রই ফল্‌ল—মাত্র একপক্ষ কাল পরেই শ্রীমতী সুলিভ্যান্ তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন: "আজ সকালে আমার হৃদয় আনন্দে গান গাইছে। অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে—আমার ছোট ছাত্রীটির মনে বুদ্ধির আলোকপাত হয়েছে এবং তার ফলে সব গেছে বদলে। দুই সপ্তাহ আগের বন্যস্বভাব মেয়েটি আজ হঠাৎ অত্যন্ত শান্তস্বভাব হয়ে গেছে। আমি লিখছি আর ও বসে আছে

আমার পাশে—ওর মুখ শান্ত এবং সুন্দর। ছোট্ট অসভ্য মেয়েটি বাধ্যতার প্রথম পাঠ শিখেছে। ওর ভিতরে এখন যে সুন্দর বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়েছে, আমার কাজ হ'ল তাকে গড়ে তোলা এবং ভালভাবে পরিচালিত করা।"

এই কয়েকদিনে হেলেন দুই একটি ক'রে কথাও শিখছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই অন্ধ মূক ও বধির মেয়েটি জান্‌তেন না কথা, নাম অথবা অক্ষরের মানে কি! শ্রীমতী সুলিভ্যান্ ওর হাতে একটি পুতুল দিতেন—তারপর মূক বধিরদের হাতের ভাষায় তাঁর হাতে ধীরে ধীরে লিখে দিতেন—পু-তু-ল। হেলেন এই আঙ্গুলের খেলায় বেশ আনন্দ পেতেন এবং যে পর্য্যন্ত তিনি শুদ্ধভাবে পুতুল কথাটি লিখ্‌তে না পার্‌তেন, সে পর্য্যন্ত নকল ক'রেই চলতেন। এইভাবে তিনি আরও অনেক কথা নকল করতে শিখ্‌লেন—প্রথম প্রথম তিনি বুঝ্‌তেন না—শুধু অভ্যাসবশতঃ নকল ক'রে যেতেন। পরে হঠাৎ একদিন তিনি হাতের ভাষার অর্থ বুঝতে পার্‌লেন। একদিন শ্রীমতী সুলিভ্যান হেলেনের হাতের উপর জলের কলটি ছেড়ে দিয়ে ওর হাতে লিখে দিলেন জ—ল। হেলেন স্থির হ'য়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বোঝবার চেষ্টা কর্‌লেন—তারপর হঠাৎ যেন তাঁর কাছে ভাষার সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল। অন্ধকারে বন্দী তাঁর আত্মা—আলোর স্পর্শ পেলে। চারিদিকের সমস্ত জিনিষ সমস্ত প্রকৃতি আজ হেলেনের কাছে নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দিলে। তিনি ভাষা-শিক্ষায় আরও বেশী মনোযোগী

হলেন। তিনি বুঝ্‌তে পারলেন যে হাতের ভাষাই তাঁকে সব কিছু জানতে সাহায্য করবে। নতুন উৎসাহ নিয়ে তিনি সেইদিনই ত্রিশটি নতুন কথা শিখলেন। তাঁর শিক্ষয়িত্রী ডায়েরীতে লিখলেন: "পরদিন ভোরবেলা হেলেন পরীর মত দিব্য দীপ্তি নিয়ে শয্যাত্যাগ করল। সে একটা জিনিষ থেকে আর একটা জিনিষে দৌড়ে ফিরতে লাগল—আমাকে জিনিষগুলোর নাম জিজ্ঞাসা করতে লাগল আর আনন্দের আতিশয্যে আমার চুমু খেতে লাগ্‌ল।"

হেলেন যেন শিকল-মুক্ত বন্দী। হাতের ভাষার সাহায্যে তিনি লোকের সঙ্গে কথা বলতে শিখ্‌লেন—তাঁর বন্ধুবান্ধবীদের হাতের ভাষা শিখানোর জন্য তাঁর কি ব্যগ্রতা! কিন্তু তাঁর ভাষা ছিল ঠিক দু'বছরের শিশুর মত—কারণ তাঁর অধিকাংশই কথাই ছিল ভাঙা ভাঙা এক একটি মাত্র শব্দ।

ছোট হেলেনের একাগ্রতা এবং উৎসাহের ফলে তাঁর দিন দিন দ্রুত উন্নতি হতে লাগ্‌ল। শিক্ষয়িত্রীর চেষ্টায় এবং নিজের যত্নে হেলেনের শিক্ষা দিন দিন এগিয়ে চলল। তাঁর এই সময়ের শিক্ষার ইতিহাস তাঁর নিজের মুখেই শোন: "আমার শিক্ষয়িত্রীর প্রতিভা, তাঁর সহজ সহানুভূতি এবং সস্নেহ কৌশলের বলেই আমার শিক্ষাজীবনের প্রথম বছরগুলো এত মধুর হয়েছিল। সুগন্ধ বনভূমিতে প্রতি খণ্ড তৃণের মধ্যে এবং আমার ছোট বোনটির অসমতল হাতের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য লুকিয়ে ছিল তা তিনিই আমায় উপভোগ করতে শেখালেন। যখন ডেজী আর বাটারকাপ্‌ ফুলের

সময় আস্ত, শ্রীমতী সুলিভ্যান্ তখন আমার হাত ধ'রে মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর পাড়ে নিয়ে যেতেন। আর সেইখানে নরম ঘাসের ওপর ব'সে আমি প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার প্রথম পাঠ শিখ্তাম। সূর্য্য এবং বৃষ্টি কি ক'রে সুগন্ধ এবং সুখাদ্য গাছপালাগুলিকে মাটির ভিতর থেকে জন্ম দেয়, পাখীরা কি ক'রে দেশ দেশান্তরে বাসা করে, কি ক'রে কাঠবিড়াল, হরিণ এবং অন্যান্য প্রাণী খাবার এবং আশ্রয় খুঁজে পায়, আমি এ সবই শিখ্লাম। যত আমার জ্ঞানবৃদ্ধি হতে লাগ্ল, ততই আমি আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে বাস করার আনন্দ অনুভব করতে লাগ্লাম।"

আমাদের সব সময় মনে রাখ্তে হবে যে যাঁকে এই সব শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল তাঁর দৃষ্টিশক্তি, বাক্শক্তি কিংবা শ্রবণশক্তি কিছুই ছিল না। শুধুমাত্র হাতের ভাষার সাহায্যে হেলেন্কে এই সব শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। শ্রীমতী সুলিভ্যানের ক্ষমতা বিস্ময়কর বটে!

হেলেন্ যখন অক্ষর কাকে বলে বুঝ্তে সুরু কর্লেন তখন তাঁকে ব্রেল পদ্ধতির উঁচু বর্ণমালা) যার সাহায্যে অন্ধরা লিখ্তে পড়্তে পারে) শিক্ষা দেওয়া হ'ল। এত তাড়াতাড়ি তিনি বর্ণমালা শিখে ফেললেন যে শীঘ্রই তিনি বন্ধুদের কাছে ভাঙা ভাঙা কথায় চিঠি লিখ্তে সমর্থ হলেন। তাঁর এই সময়ের লেখা একখানা চিঠি শোন : "হেলেন্ এ্যানাকে লিখ্ছে—জর্জ্জ হেলেন্কে আপেল দেবে—জ্যাক্ হেলেন্কে আক দেবে—ডাক্তার মিল্ড্রেড্কে ওষুধ দেবেন—মা মিল্ড্রেডের জন্য নতুন পোষাক

তৈরী কর্‌বেন।” শ্রীমতী সুলিভ্যান্ যখন তাঁর শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হলেন, তার ঠিক সাড়ে তিনমাস পরে এই চিঠি লেখা হয়েছিল। এর ঠিক এক বছর পরে তিনি লম্বা লম্বা চিঠি লিখ্‌তে শিখ্‌লেন। আট বছরের এই মূক, বধির ও অন্ধ বালিকাটি অসাধ্য সাধন করলেন।

শীঘ্রই তিনি নানা বিষয়ে নিয়মিত পড়াশুনো সুরু করলেন। অঙ্কে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখালেন। যখন তাঁর এগারো বছর মাত্র বয়েস তখন তিনি ভগ্নাংশের সমস্যা পর্য্যন্ত করেছিলেন।

একদিন একটা অঙ্ক কিছুতেই মিল্‌ছিল না তখন তাঁর শিক্ষয়িত্রী বললেন: “একটু উঠে বেড়িয়ে এস—তা’হলে হয় ত অঙ্কটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।” মাথা নেড়ে হেলেন জবাব দিলেন: “না, তাহলে আমার শত্রুরা মনে করবে যে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। আমি এখনই এখানে ব’সে শত্রুকে জয় কর্‌ব।” তিনি ক’রেও ছিলেন তাই! এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসই ছিল হেলেনের জীবনের মূলমন্ত্র—এর জোরেই তিনি জীবনের অসম্ভব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক’রে কৃতকার্য্যতা লাভ করেছিলেন। হেলেনের চরিত্রের এই অটুট কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস আমাদের বিস্মিত করে।

তিনি হাতের ভাষার সাহায্যে শ্রীমতী সুলিভ্যানের কাছে শিক্ষা লাভ কর্‌তে লাগ্‌লেন। এমনি ক’রে তিন বছর গেল—হেলেনের বয়স হ’ল দশ বৎসর। এখন তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হ’ল তিনি সাধারণ দশজনের মত কথা বল্‌তে শিখ্‌বেন।

বধির লোকেরা সাধারণতঃ বোবা হয়, কারণ ঠোঁট এবং জিহ্বার সাহায্যে লোকে যে শব্দ উচ্চারণ করে তা তারা শুনতে পায় না। অনেক সময় বোবা লোকেরা যদি অতি যত্নে অন্যের ঠোঁটের নড়া-চড়া লক্ষ্য ক'রে, তবে ঠোঁট-নাড়া নকল ক'রে কথা বল্‌তে পারে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা কথা বলবার সময় লোকের ঠোঁট-নাড়া অনুকরণ কর্‌লেও শব্দ কর্‌তে পারে না। ছোট হেলেনের পক্ষে অন্যের ঠোঁটের নড়াচড়া পর্য্যন্ত দেখ্‌বার উপায় ছিল না ; তবে তিনি হাত দিয়ে ঠোঁট-নাড়া অনুভব কর্‌তে পারতেন এই যা। এত বাধা অতিক্রম ক'রে তিনি কি ক'রে কথা বল্‌তে পার্‌বেন ?

তাঁর সমস্ত বন্ধুবান্ধবেরা এমন কি শ্রীমতী সুলিভ্যান পর্য্যন্ত তাঁকে হতাশ কর্‌তে লাগ্‌লেন—তাঁরা তাঁকে এই দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা কর্‌লেন। কিন্তু হেলেনের প্রতিজ্ঞা কিরূপ দৃঢ় ছিল তা আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি। তিনি যে বিষয়ে মনস্থির কর্‌বেন তা না ক'রে ছাড়্‌বেন না। কাজেই শ্রীমতী সুলিভ্যান তাঁকে শ্রীমতী ফুলার নাম্নী একটি ঠোঁটের ভাষায় বিশেষজ্ঞা শিক্ষয়িত্রীর কাছে নিয়ে গেলেন। শ্রীমতী ফুলারের কাছে তিনি নিয়মিত পাঠ নিতে লাগ্‌লেন—অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার বলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল। দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে তিনি কথা বল্‌তে শিখ্‌লেন। এমন কি তিনি বধিরদের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী একদল লোকের কাছে বক্তৃতা পর্য্যন্ত দিলেন। প্রথম দিন বক্তৃতা দেবার সময় তাঁর কত আনন্দ হয়েছিল তা তোমরা অনুমান কর্‌তে পার কি ?

তাঁর সেই প্রথম বক্তৃতার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত কর্‌ছিঃ "আপনাদের কাছে বক্তৃতা কর্‌তে পারায় আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা যদি আপনারা জান্‌তেন! আমার সেই পূর্ব্বেকার দিনের কথা মনে পড়ে—তখন আমি কথা বল্‌তে শিখিনি—তখন শুধু হাতের ভাষার সাহায্যে আমি আমার ভাব প্রকাশের চেষ্টা কর্‌তাম। আমার মনের ভাবগুলো মুক্তিকামী ছোট পাখীর মত আমার আঙ্গুলের ওপরে এসে আঘাত কর্‌ত। অবশেষে শ্রীমতী ফুলার এসে কারাগারের দরজা খুলে তাদের মুক্তি দিলেন।...এই মুক্তির পথে ছিল অনেক বাধা, অনেক হতাশা, কিন্তু আমি চেষ্টা ক'রে চললাম কারণ আমি জান্‌তাম যে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় শেষ অবধি জয়ী হবেই।"

হেলেনের যখন চৌদ্দ বছর বয়েস তখন তিনি একটি বধিরদের স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। সেখানে তিনি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং জার্ম্মান ভাষা শিখ্‌লেন। ষোল বছর বয়সের সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তৈরী হবেন ব'লে একটি সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'লেন। তিনি বক্তৃতাদি শুন্‌তে পেতেন না ব'লে শ্রীমতী সুলিভ্যান ক্লাসে ব'সে হাতের ভাষার সাহায্যে তাঁকে সব বুঝিয়ে দিতেন। অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরাও তাঁকে অবশ্য বিশেষ সাহায্য কর্‌তেন, তবে শ্রীমতী সুলিভ্যান্ ছিলেন তাঁর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারিণী।

সতের বছর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায়

সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। উনিশ বছর বয়সে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলেজে প্রবেশ করিলেন।

কলেজে প্রবেশ ক'রে তিনি অত্যন্ত সুখী হলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অসুবিধাও হ'ল খুব। তাঁকে যে সব বই পড়তে হ'ত তার অনেকগুলোই ব্রেল পদ্ধতিতে ছাপা ছিল না। তাই অন্য একজন হাতের ভাষার সাহায্যে তাঁকে বুঝিয়ে দিলে তবে তিনি পাঠ তৈরী করতে পারতেন। এতে অন্যান্য মেয়ের চেয়ে তাঁর পাঠ তৈরী করতে বেশী সময় লাগ্‌ত। অনেক সময় তিনি বুঝ্‌তে পার্‌তেন যে তাঁর সহপাঠিনীরা পাঠ শেষ করে বাইরে খেলা-ধূলা কর্‌ছে আর তিনি চুপ ক'রে ব'সে পাঠ তৈরী কর্‌ছেন—তখন তাঁর বিদ্রোহ করার ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু এরকম মনোভাব তাঁর বেশীক্ষণ থাক্‌ত না—আবার তাঁর মুখ হাসিতে ভ'রে উঠ্‌ত। তিনি আবার নিষ্ঠুর নিয়তির বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান চালাতেন।

তিনি কলেজের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস এবং সাহিত্য মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি যে শুধু বই পড়েই আনন্দ পেতেন তা নয়। তিনি খেলা-ধূলা খুব ভালবাসতেন—ছোটবেলা থেকে ভাল সাঁতার কাটতে পার্‌তেন এবং নৌকা চালাতেও ভালবাস্‌তেন। তিনি লিখেছেন: "আমার বন্ধুরা বেড়াতে এলে তাঁদের নৌকা-ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে বেশী আনন্দ আমি আর কিছুতে পাই না। কেউ একজন পিছনে ব'সে হাল ধরে, আর আমি দাঁড় টানি—অনেক সময় আবার আমি হাল্ ছাড়াই দাঁড় বেয়ে

চলি। তীরের কাছের ঘাস আর ফুলের গন্ধে দাঁড় বেয়ে যেতে কি আরাম!” তিনি ঘোড়ায় চড়্‌তে এবং সাইকেলে চড়্‌তে ভালবাস্‌তেন। তা ছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দৌড়ানো আর খেলা করায় তিনি খুব আনন্দ পেতেন। এমনি ক’রে তিনি তাঁর অন্ধ বধির জীবনকে পূর্ণ ক’রে তুলেছিলেন। যাদের দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি আছে তারাও বুঝি তাঁর চেয়ে বেশী ক’রে জীবনের আনন্দ উপভোগ করে না। এই যশস্বিনী মহিলার জীবন কর্ম্মময়—তিনি অনেকগুলি পুস্তকও রচনা করেছেন।

এক এক সময় তাঁর বড় একা একা বোধ হয়। তিনি যে পৃথিবীর সৌন্দর্য্য চোখে দেখ্‌তে পেলেন না সেজন্য তাঁর দুঃখ হয়। তখনই এই নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ ক’রে আশার আলোক দেখা যায়। “আশা মধুর হেসে আমার কাছে আসে, আর চুপি চুপি বলে, ‘নিজেকে ভোলার মধ্যেও আনন্দ আছে।’ কাজেই আমি অন্যের চোখের দৃষ্টিকে সূর্য্য ব’লে মনে করি, অন্যের সঙ্গীত আমাকেও আনন্দ দেয় আর অন্যের ঠোঁটের হাসি আমাকে দেয় সুখ।”

অন্ধকারের বন্দী

এই যে সুন্দর আলোকিত পৃথিবী—এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য-রাজি আমরা কেমন ক'রে উপভোগ করি বল ত? তোমরা নিশ্চয়ই সমস্বরে বলবে "চক্ষু দিয়ে"। প্রকৃতিদত্ত এই এক-জোড়া চোখে যাঁরা দেখ্‌তে পান না, ভগবানের সৃষ্টিবৈচিত্র্য যাঁদের কাছে চির-অপরিচিত, চির-রহস্যময়, সেই সব হতভাগ্য-দের দুর্দ্দশার কথা ভেবে দেখ। পাঁচ মিনিটের জন্য যদি তোমার চোখ বেঁধে দেওয়া যায়, তবে তোমার কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। আর চিরদিনের জন্য যাঁরা অন্ধ, তাঁদের অবস্থা কি ভীষণ হতে পারে তা সহজেই অনুমান কর্‌তে পার। এই অসহায় হতভাগাদের আর দুঃখের পরিসীমা নেই। এই সব হতভাগা, অন্ধকারের কারাগারে যাঁরা চিরবন্দী, আলোর দেশের অধিবাসী হয়েও যাঁরা এক মুহূর্ত্তের জন্য আলোর মুখ দেখ্‌তে পান না, প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এমন কোন ব্যবস্থা মানুষের জানা ছিল না যার সাহায্যে এদের শিক্ষা বিধান করা চল্‌ত। কিন্তু আজ অন্ধদের সে অভাব পূর্ণ হয়েছে—তাঁদেরই মত এক হতভাগা অন্ধব্যক্তির প্রচেষ্টায়। তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি মতে অন্ধদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ আজ সহজ-সাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাতঃস্মরণীয় এই মহাপুরুষের নাম লুই ব্রেল্ (Louis Braille)।

লুই ব্রেলের পিতার একটি ছোট দোকান ছিল—এই দোকানে ঘোড়ার জিন, লাগাম প্রভৃতি তৈরী হ'ত। বালক

লুই পিতার কারখানায় ব'সে খেলা করতে ভালবাসতেন। ছোট্ট লুই একদিন একটি ধারাল লৌহ-যন্ত্র নিয়ে ছোট চামড়ার টুকরো ফুটো করছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যন্ত্রটি একবার কি ক'রে তাঁর হস্তচ্যুত হয়ে তাঁর চোখে লাগল। চোখ নিয়ে তাঁকে অনেক ভুগতে হ'ল। কিন্তু ভাল হওয়া ত দূরের কথা, কিছুদিন পরে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে পড়লেন। অন্ধ অবস্থায় তিনি কেবল অন্ধদের দুরবস্থার কথা ভাবতেন—কি ক'রে অন্ধদের শিক্ষা বিধান করা যেতে পারে এই হ'ল তাঁর একমাত্র চিন্তা। চামড়া ছিদ্র করার সময় একটা জিনিষ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—এক টুক্‌রো চামড়ার অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত যদি ফুটো

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V X Y Z and for of the with

ch gh sh th wh ed er ou ow W
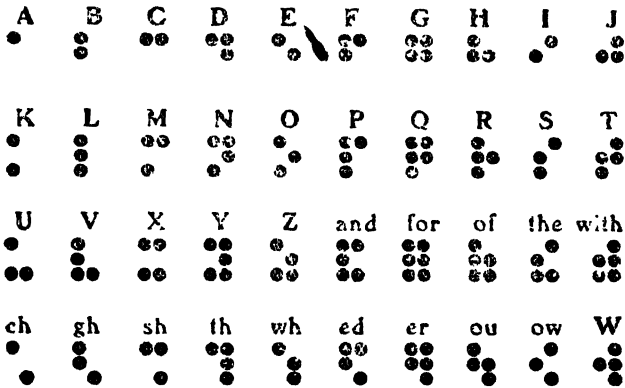
করা যায়, তবে ওপিঠে বিন্দুর মত একটা স্থান উচু হয়ে উঠে। হাত দিয়ে স্পর্শ করলেও এ জিনিষটা ভালভাবে অনুভব করা যায়। লুই হট্‌বার পাত্র ছিলেন না—এই ছোট বিষয়টিকে কেন্দ্র ক'রে তিনি তাঁর গবেষণা চালালেন এবং শীঘ্রই তিনি

অন্ধদের শিক্ষার উপযোগী এক বর্ণমালা (alphabet) আবিষ্কার ক'রে ফেললেন। চামড়ার অপর পিঠের ছোট ছোট বিন্দুর মত, কাগজের উপরে ছোট ছোট উঁচু বিন্দু (যে বিন্দু স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়) দিয়ে তিনি অন্ধদের জন্য বর্ণমালার সৃষ্টি করলেন। কেবলমাত্র উঁচু বিন্দুর সাহায্যেই এই বর্ণমালার সমস্ত অক্ষর গঠিত; যেমন A লেখা হয় একটি উঁচু বিন্দু দিয়ে, B লেখা হয় উপরে নীচে দুইটি উঁচু বিন্দু দিয়ে ইত্যাদি। অন্ধদের জন্য আবিষ্কৃত এই বর্ণমালার প্রতিচ্ছবি এখানে দেওয়া গেল। লুই ব্রেলের দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত ব'লে এই লিখন পদ্ধতির নাম ব্রেল্ পদ্ধতি (Braille Method)। অন্ধদের শিক্ষাদান ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ ছিল খুব বেশী, শীঘ্রই এই ব্রেল্ পদ্ধতি তাঁদের ভাল লেগে গেল। সামান্য কিছু পরিবর্ত্তন ক'রে এই ব্রেল্ পদ্ধতি শীঘ্রই পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্ধদের বিদ্যালয়-সমূহে গৃহীত হ'ল। অন্ধদের জন্য বহু প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্রেল্ পদ্ধতিতে ছাপানো হ'ল। অন্ধ বালক লুই এমনি ক'রে অন্ধদের জন্য মুক্তির পথ নির্ম্মাণ করলেন। এজন্য জগৎ আজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি নিজে অন্ধ হয়েছিলেন ব'লেই অন্ধদের ব্যথা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন।

প্রকৃতিদত্ত দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও যাঁরা জগতে উন্নতি করেছেন এবং করছেন তাঁদের কথা শুনতে বোধ হয় তোমাদের খুবই ভাল লাগে। জগতে এমন উদাহরণ বহু আছে যাঁরা অন্ধ হয়েও জীবনের নানা বিভাগে উন্নতি করেছেন। কিন্তু স্থানাভাবে তাঁদের কথা আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের

এই বাংলাদেশের দুই একটি অন্ধ ব্যক্তির কৃতিত্ব সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বল্‌ব। কলিকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে একজন অন্ধ অধ্যাপক আছেন—তাঁর নাম শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তিনি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে বসন্তরোগে আক্রান্ত হ'য়ে দুটি চক্ষুই হারান। এততেও তিনি দমে যান নি। অদম্য উৎসাহে তিনি কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয়ে পড়্‌তে থাকেন। তিনি দুইবার এম্‌, এ, পাশ করেছেন—একবার অর্থনীতিশাস্ত্রে ও আর একবার দর্শনশাস্ত্রে। অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে এ কি কম কৃতিত্বের কথা!

এবার আর একজন বাঙ্গালীর কথা বল্‌ছি—এঁর নাম শ্রীযুক্ত সুবোধ রায়। ইনিও অন্ধ। অন্ধ অবস্থাতেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌, এ, ও আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তৎপর তিনি অন্ধদের শিক্ষাদানপদ্ধতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি নিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপ গিয়েছেন। বর্ত্তমানে তিনি আমেরিকা থেকে উপাধি নিয়ে ফিরে এসেছেন। আর একটি উদাহরণ দিয়েই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ কর্‌ব। এবার যাঁর কথা বলছি এঁর নাম শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র গুপ্ত। ইনি অর্থনীতিশাস্ত্রে অনার্স সহ সসম্মানে বি, এ, পাশ ক'রে এম্‌, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এঁর পিতা প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী ও কংগ্রেসকর্ম্মি মিঃ জে, সি গুপ্ত। সাধনবাবু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ে শতকরা ৮০ নম্বরের উপরে পেয়েছিলেন এবং গড়ে পেয়েছিলেন শতকরা ৭৫ নম্বরের

উপর। আই, এ, পরীক্ষায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দশম স্থান অধিকার করেছিলেন। পরে আইন পরীক্ষায় পাশ করে সাধনবাবু কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছেন। অন্ধ লোকের পক্ষে এসব কি কম কৃতিত্বের কথা। কাজেই বাইরের জগতের সূর্য্যালোক থেকে অন্ধেরা যদিও আজ পর্য্যন্ত বঞ্চিত, তবু ব্রেল্ সাহেবের কৃপায় অন্তরের সূর্য্যালোক থেকে আজ তাঁরা বঞ্চিত নন!

উপরের যে সব কৃতী বাঙ্গালী সন্তানদের কথা বলা হ'ল, তাঁরা তিনজনেই কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কলিকাতায় যে একটি অন্ধ-বিদ্যালয় আছে, একথা বোধ হয় তোমরা অনেকেই জান না। এই অন্ধবিদ্যালয়টি কলিকাতার উপকণ্ঠে বেহালায় অবস্থিত। দুঃখের বিষয়' অন্ধদের শিক্ষাবিধানের জন্য পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশে যে রকম সুব্যবস্থা আছে, ভারতে এখনও সেরূপ সুব্যবস্থা হয়ে উঠেনি। ভারতে অন্ধ লোকের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ! এদের শিক্ষার সুব্যবস্থা যাতে হয়, গভর্ণমেন্টের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

যাক্, কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয় সম্বন্ধে আর দুএকটি কথা ব'লে বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করব। তোমরা যারা এ পর্য্যন্ত বেহালা অন্ধ বিদ্যালয় দেখনি, তারা অবশ্য অবশ্য গিয়ে দেখে এস। এখানে অনেক কিছু শিখবার জিনিষ পাবে। অন্ধ ছাত্রদের খেলাধূলা ও কার্য্যক্ষমতা দেখে তোমরা অবাক্ হয়ে যাবে। কি সঙ্ঘবদ্ধ, কি সুনিয়ন্ত্রিত এদের জীবন। প্রাত্যহিক

পড়াশুনা ছাড়াও এরা নিয়মিত ব্যায়াম, সাঁতার কাটা, সঙ্গীত প্রভৃতি অভ্যাস করে। এই সব হতভাগ্য অন্ধদের মুখে হাসি দেখলে প্রাণে অপরিসীম আনন্দ হয়।

নিয়মিত পড়াশুনা ছাড়াও, অন্ধ ছাত্রেরা যাতে সহজে জীবিকানির্ব্বাহ কর্‌তে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এদের বেতের কাজ, ঝুড়ি তৈরী প্রভৃতি নানারকম শিল্পকার্য্যও শেখানো হয়ে থাকে। প্রায় ৪২ বৎসর পূর্ব্বে মাত্র একটি ছাত্র নিয়ে এই বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আজ বাঙ্গলাদেশের কত হতভাগ্য অন্ধ-সন্তান এদের কৃপায় মানুষ হয়ে উঠছে। বেহালা অন্ধবিদ্যালয়ে বর্ত্তমান প্রধান শিক্ষক মিঃ এ, কে, শাহের সুযোগ্য পরিচালনায় বিদ্যালয়টি ক্রমাগত উন্নতির পথে চলেছে। ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টির আরও উন্নতি হবে, এটা আমরা আশা করতে পারি। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার্ জন এণ্ডারসন্ এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন ক'রে কি বলছেন শোন,—"আমি কলিকাতার অন্ধবিদ্যালয় পরিদর্শন ক'রে যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছি এদের কার্য্যকলাপ দেখে। বিদ্যালয়টি ভালভাবে পরিচালিত হয় এবং সর্ব্বোপরি নানারকমের ছেলে-মেয়েদের প্রফুল্ল তেজোব্যঞ্জক মুখ দেখে সত্যই আমি অভিভূত হয়েছি। এসব দেখে শুনে, ব্রেল্ সাহেবের আবিষ্কৃত শিক্ষাপদ্ধতি এদের হতভাগ্য জীবনে যে কিরূপ সুফল প্রদান কর্‌ছে তা বুঝতে পারছি।"

খনি-শ্রমিকের বন্ধু

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার্ হাম্ফ্রি ডেভি (Sir Humphry Davy), বিস্ফোরণের হাত থেকে খনির শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য বহু পরীক্ষা ক'রে এক প্রকার বাতি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই বাতি 'ডেভির সেফ্‌টি ল্যাম্প' নামে বিখ্যাত। সেইজন্য স্যার হামফ্রি ডেভিকে অনেক সময় 'খনি-শ্রমিকের বন্ধু' বলা হয়।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে তাঁর জন্ম হয়েছিল। পেনজান্স্ নামক স্থানে তাঁরা বাস কর্‌তেন। আর দশজন ছেলের মত তিনি পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে যেতে আরম্ভ করেন। বাড়ীতে তাঁর মা এবং ঠাকুমা তাঁকে কবিতা পড়ে শোনাতেন আর তাঁর কাছে অনেক গল্প বল্‌তেন। কবিতা আর গল্প শুনতে ছোট্ট ডেভির কখনও ক্লান্তিবোধ হ'ত না। স্কুলের ছুটির পর অনেক ছেলে এসে ডেভিকে ঘিরে ধরত—তিনিও তাদের কাছে বাড়ীতে-শোনা গল্প বল্‌তেন—অনেক সময় নিজেও গল্প রচনা ক'রে বল্‌তেন। ছোটবেলা থেকে তিনি কথা বলতে ও বক্তৃতা দিতে খুব বেশী ভালবাস্‌তেন। কেউ তাঁর বক্তৃতা শুন্‌ছে কি শুন্‌ছে না, সেদিকে তাঁর লক্ষ্য থাকৃত না। যখন তাঁর বক্তৃতা শুন্‌বার কেউ থাকৃত না, তখন তিনি নিজের ঘরে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে দেওয়ালের কাছেই বক্তৃতা দিতেন।

ষোল বৎসর বয়সে ডেভির পিতৃবিয়োগ হয়। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে ডেভিই ছিলেন বড়। তিনি বুঝ্‌তে

পার্‌লেন যে, তাঁর আর পড়াশুনা করা হয়ে উঠ্‌বে না, কারণ সমস্ত সংসার প্রতিপালনের ভার এসে পড়্‌ল তাঁর উপরে। তাই তিনি একজন ঔষধ-বিক্রেতা অস্ত্র-চিকিৎসকের কাছে কাজ শিখ্‌তে লাগলেন। তাঁকে অত্যন্ত পরিশ্রম কর্‌তে হ'ত—তবু অবসর সময়ে তিনি অঙ্ক ও রসায়ন শাস্ত্রের চর্চ্চা কর্‌তেন। এই দুটি বিদ্যার উপর তাঁর ছিল অপরিসীম ঝোঁক। বিশেষ ক'রে রসায়ন শাস্ত্র ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। শীঘ্রই তিনি নিজের বাড়ীতে ক্ষুদ্র একটি রসায়নাগার স্থাপন ক'রে সেখানে নিজেই নানাপ্রকার গাসের সাহায্যে পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। পরীক্ষাগারে গ্যাসের বিস্ফোরণের ভয়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাক্‌তেন। উনিশ বৎসর বয়েস হওয়াব আগেই ডেভির বৈজ্ঞানিক গবেষণার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। কিন্তু নিজের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় কতদিন আর ভালভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো যায়? ভগবানের দয়ায় শীঘ্রই ডেভির জীবনে একটা অপূর্ব্ব সুযোগ এল। তিনি ব্রিষ্টলের একটি গবেষণাগারের পরিদর্শকপদে নিযুক্ত হলেন।

ডেভি এই অপূর্ব্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার কর্‌তে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। ব্রিষ্টলের গবেষণাগারে ব'সে তাঁর নিত্য নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চল্‌তে লাগ্‌ল। প্রথমেই তিনি নাইট্রাস্ অক্সাইড্ (Nitrous Oxide) নামক একটি বিষাক্ত গ্যাসের পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্য লাভ কর্‌লেন। ডাক্তারেরা এই গ্যাসকে অত্যন্ত বিষাক্ত ব'লে মনে কর্‌তেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, এ গ্যাস মানুষের প্রাণনাশক। ডেভি কিন্তু উহা

তত বিষাক্ত ব'লে মনে করতেন না। তাই তিনি নিজের উপর এই গ্যাস্ প্রয়োগ কর্‌বেন ঠিক কর্‌বেন। তিনি কিছুটা গ্যাস্ নাক দিয়ে ভিতরে টেনে নিলেন—তার ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর জ্ঞান লোপ পেল। লুপ্ত-জ্ঞান অবস্থায় তিনি অনেক ভাল স্বপ্ন দেখলেন আর যখন জ্ঞান হ'ল তখন হাস্‌তে হাস্‌তে জেগে উঠ্‌লেন। কাজেই এই নাইট্রাস্ অক্সাইড্ গ্যাসের নাম দেওয়া হ,ল 'লাফিং গ্যাস্' (Laughing gas)।

তারপর থেকে রোগীদের অজ্ঞান করার জন্য ডাক্তাররা অবাধে এই গ্যাস্ ব্যবহার কর্‌তে লাগলেন। ডেভির খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়্‌ল। আরও অনেক গ্যাস্ তিনি নিজের উপর প্রয়োগ কর্‌লেন। একবার একটা গ্যাস্ শুঁকে তিনি মারা গিয়েছিলেন আর কি! বহু কষ্টে তাঁর চৈতন্য-সম্পাদন করা হয়েছিল। প্রায় আড়াই বছর ধ'রে তিনি ব্রিষ্টলের গবেষণাগারে কার্য্য-ব্যাপৃত থাক্‌লেন। অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও তিনি সেই সময়ে প্রকাশিত করেন। সেই সব মূল্যবান্ প্রবন্ধ রচনার ফলে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই রয়্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউশানের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং গবেষণাগারের নির্দ্দেশক নিযুক্ত হলেন। তেইশ বৎসরের যুবকের পক্ষে এটা কত বড় সম্মানের কথা!

অধ্যাপক হিসাবে তিনি শীঘ্রই যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন কর্‌লেন—তাঁর ছোটবেলার বক্তৃতা দিবার অভ্যাস এখন যথেষ্ট কাজে লাগল। বিজ্ঞানের মত জটিল বিষয় অতি সরল ক'রে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অদ্ভুত। তাই

শীঘ্রই তিনি ছাত্রমহলে খুব প্রিয় হলেন। কিন্তু অধ্যাপক হিসাবে তাঁর এই খ্যাতির জন্যই যে তাঁকে আজও আমরা স্মরণ করি তা নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে তিনি যে সব নূতন তথ্য আবিষ্কার ক'রে গেছেন' তারই ফলে আজও তিনি অমর হয়ে আছেন!

ডেভিই প্রথম বৈদ্যুতিক আর্ক্‌লাইট্‌ (arch-light) নির্ম্মাণ করেন। ক্লোরাইনের (chlorinc) গুণাবলীও তিনি প্রথম নির্দ্ধারণ করেন। আয়োডিনের প্রকৃতি এবং ব্যবহার সম্বন্ধে—তা ছাড়া কৃষিকার্য্যের সহায়ক প্রচুর গবেষণাও তিনি ক'রে গেছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগতের বাইরে অর্থাৎ সাধারণের মাঝে তিনি যে জিনিষটির জন্য সবচেয়ে বেশী আদৃত, সেটি হ'চ্ছে তাঁর 'সেফ্‌টি ল্যাম্প্‌'। উহা আবিষ্কার ক'রে তিনি জগতের যে কি উপকার ক'রে গেছেন তা ব'লে শেষ করা যায় না।

প্রতি বছর ইংলণ্ডের কয়লার খনিগুলিতে অনেক বিস্ফোরণ ঘট্‌ত এবং তার ফলে বহু হতভাগ্য শ্রমিকের প্রাণ যেত। খনির মধ্যে অন্ধকার ভূগর্ভে প্রায়ই বহু গ্যাস্‌ জমে! সব গ্যাসের মধ্যে কাজ করার উপযোগী কোন নিরাপদ ল্যাম্প্‌ তখন আবিষ্কৃত হয়নি। যে সব ল্যাম্প্‌ শ্রমিকরা ব্যবহার কর্‌ত, অনেক সময় তার আগুন বাইরে গ্যাসের সংস্পর্শে আসার ফলে ভীষণ বিস্ফোরণ ঘট্‌ত; আর সেই বিস্ফোরণে প্রাণ দিত অসহায় শ্রমিকের দল। এই সব দেখে যুবক ডেভির মনে অসহায় শ্রমিকেব জন্য বড় বেদনা

বোধ হ'ত। প্রায়ই তিনি ভাবতেন—কি ক'রে এদের অকাল-মৃত্যু বন্ধ করা যায়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ। এই বছরে ইংলণ্ডের খনিগুলিতে বেশীরকম বিস্ফোরণ ঘট্‌ল। বৈজ্ঞানিক হিসাবে ডেভির নাম তখন সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। খনির মালিকেরা উপায়ান্তর না দেখে ডেভির কাছে প্রতিকারের জন্য আবেদন কর্‌লেন। ডেভি তখনই নিউক্যাসেলের কয়লার খনিগুলি পরীক্ষা করতে চল্‌লেন। তিনি বহু পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে সুপ্রসিদ্ধ 'সেফ্‌টি ল্যাম্প্‌' আবিষ্কার কর্‌লেন। সূক্ষ্ম তারের আবেষ্টনী দিয়ে এই ল্যাম্প্‌ তৈরী করা হ'ল। এতে আলো হ'ত যথেষ্ট; কিন্তু অগ্নিশিখা বা উত্তাপ, সূক্ষ্ম তারের বেড়া ভেদ ক'রে বাইরের গ্যাসের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণ ঘটাতে পার্‌ত না। ডেভির এই আবিষ্কারের ফলে হাজার হাজার শ্রমিক অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

ডেভির তখন কি সুনাম! সারা ইংলণ্ডময়—সারা ইউরোপময়—লোকের মুখে মুখে ডেভির নাম। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে 'স্যার্‌' উপাধিতে ভূষিত কর্‌লেন। তারপর তিনি ইউরোপ-ভ্রমণে বের হন। প্রত্যেক দেশেই তিনি পেতে লাগলেন সাদর অভ্যর্থনা।

এর কয়েক বছর আগে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ফ্রান্স থেকে একটি স্বর্ণপদক উপহার পেয়েছিলেন। তখন ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ চল্‌ছিল। বন্ধু-বান্ধবেরা ডেভিকে স্বর্ণপদক প্রত্যাখ্যান করতে অনুরোধ করায় তিনি উত্তর

দিয়েছিলেন—"দুই দেশের গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যুদ্ধ থাকতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ত আর যুদ্ধ নেই।"

দেশ-দেশান্তরে তাঁর যথেষ্ট সম্মান হয়েছিল সত্য, কিন্তু তিনি কখনও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনের লোভে নিজের প্রতিভার অপব্যবহার করেননি। তিনি যখন 'সেফ্‌টি ল্যাম্প্‌' আবিষ্কার করলেন, তখন অনেকেই উপদেশ দিয়েছিলেন—এই ল্যাম্পের সর্ব্বস্বত্ব নিজের ক'রে রাখতে। কিন্তু মহাপ্রাণ ডেভি উত্তর দিয়েছিলেন—"আমি এমন কথা কখনও ভাবিনি। আমার এই 'সেফ্‌টি ল্যাম্প্‌' তৈরীর উদ্দেশ্য—মানবের উপকার করা। আমার সেই উদ্দেশ্য যদি সফল হয়ে থাকে, তবেই আমি নিজেকে যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করব।" অর্থ-বিষয়ে তিনি ছিলেন এতই নিস্পৃহ!

ক্রীতদাসের বন্ধু

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাণিজ্য-জগতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের উইল্‌বার্‌ফোর্স্‌ পরিবার ধনী হয়ে উঠ্‌লেন। যাঁর জীবনী আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, সেই মহাপুরুষ উইলিয়াম উইলবারফোর্স এই পরিবারেরই ছেলে। তাঁর বাবার নাম রবার্ট্‌ উইল্‌বার্‌ফোর্স্‌ ও মার নাম এলিজাবেথ্‌। হালের হাই ষ্ট্রীটে তাঁদের মস্ত বড় বাড়ী ছিল—এই বাড়ীতেই ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট উইলিয়ামের জন্ম হয়েছিল। উইলিয়ামের যখন মাত্র আট বছর বয়েস,

তখন তাঁর বাবা মারা যান। কাজেই অল্প বয়সে উইলিয়াম্ পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলেন—পরে তাঁদের এক ধনী আত্মীয়ের মৃত্যুতে এই সম্পত্তির পরিমাণ আরও বেড়ে গেল। ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হালের গ্রামার্ স্কুলে প্রেরিত হলেন—এখানে তিনি শীঘ্রই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করলেন। তিনি অতি শীঘ্রই পড়তে শিখলেন। তাঁর গলার স্বর খুব মধুর ছিল—তাঁর এই কণ্ঠমাধুর্য্য তাঁকে সারা জীবন সাহায্য করেছে। তাঁর এই কণ্ঠমাধুর্য্যের জন্য শিক্ষক তাঁকে দিয়ে বই পড়িয়ে তাঁর সহপাঠীদের শোনাতেন।

পিতার মৃত্যুর পর উইলিয়াম্ উইম্বল্ডনে তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে বাস করতে গেলেন। এখানে তিনি নিকটস্থ পাট্নী স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। খৃষ্টানদের মধ্যে একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে—তাকে মেথডিষ্ট্ (Methodist) সম্প্রদায় বলে। উইলিয়ামের এই আত্মীয় এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন এই সম্প্রদায়ের লোক। কিছুদিন পরে উইলিয়ামের মা জান্তে পারলেন যে তাঁর ছেলেকে মেথডিষ্ট্ সম্প্রদায়-ভুক্ত করার চেষ্টা চল্ছে—তিনি এই সম্প্রদায়কে বড় ঘৃণা করতেন। তাই ছেলেকে তিনি উইম্বল্ডন্ থেকে নিয়ে গেলেন এবং পক্লিংটন্ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন। এইখানে তিনি কিছুদিন পড়লেন।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উইলিয়াম্ কেম্ব্রিজের সেণ্ট্ জন্স্ কলেজে ভর্ত্তি হলেন। এখানে প্রথম তিনি মাতাল অসচ্চরিত্র একদল সহপাঠীর পাল্লায় পড়লেন—এদের তিনি

চুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না। এদের দল থেকে বেরিয়ে তিনি আর একদল সহপাঠীর হাতে পড়্‌লেন—তারা তাঁকে সর্ব্বদা তোয়াজ ক'রে চল্‌ত এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁকে মাথায় ক'রে রাখ্‌ত। উইলিয়াম্‌কে বড়লোকের ছেলে দেখে তারা তাঁকে চাটুকারিতায় মুগ্ধ ক'রে তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা কর্‌ত। পরজীবনে তিনি এদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন। "আমাকে অলস ক'রে রাখাই যেন তাদের উদ্দেশ্য ছিল।" যা হ'ক তিনি কেম্ব্রিজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন বেশ নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়ে দিলেন —তাঁর নিজের ঘরে তিনি অনেক পার্টি দিতেন এবং তাতে তাঁর চাটুকারী বন্ধুর দল সানন্দে যোগ দিত।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ্‌ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মনস্থ কর্‌লেন যে পারিবারিক ব্যবসায়ে যোগ না দিয়ে তিনি সাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর্‌বেন। তখন পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচনের সময় প্রায় আগত—তিনি হালের ভোটদাতাগণকে নির্ব্বাচন-কার্য্য সম্বন্ধে সজাগ ক'রে তোলার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। হালের প্রায় তিন শ লোক লণ্ডনে টেম্‌স্‌ নদীর তীরে বাস কর্‌ত—তিনি তাদের সমর্থন লাভের আশায় লণ্ডনে গেলেন। সেখানে তাদের তিনি অনেক ভোজ দিলেন এবং তাঁর অননুকরণীয় মধুর কণ্ঠস্বরে তাদের কাছে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল—এই মধুর কণ্ঠস্বরের জন্য পরজীবনে তিনি ইংলণ্ডের আইন-সভা, হাউস্‌ অফ্‌ কমন্সের 'নাইটিঙ্গেল' উপাধি পেয়েছিলেন। নির্ব্বাচনে উইলিয়াম্‌ ১১২৬ ভোট পেলেন। তাঁর

দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁরা দুজনে মিলে পেলেন ঠিক ১১২৬ ভোট। কাজেই উইলিয়াম্ পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হলেন।

পার্লামেণ্টে উইলিয়ামের সঙ্গে পিটের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ'ল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে পিট্ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হলেন। উইলিয়াম্ পিটের বড় সমর্থক। পার্লামেণ্টে তিনি তাঁর বন্ধু পিটের গুণকীর্ত্তন ক'রে খুব সুন্দর একটি বক্তৃতা দিলেন।

লণ্ডনের সমাজে পিট্ তাঁর বন্ধু উইলিয়াম্‌কে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় ছ'টা ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন —তখন এই অভিজাত সমাজে বাজী রেখে জুয়াখেলা চল্‌ত। উইলিয়াম্ এক রাতে বাজীতে প্রায় ৬০০পাউণ্ড্ লাভ করলেন। কিন্তু যাদের কাছে তাঁর এই পাওনা—তাঁদের ৬০০ পাউণ্ড দেবার সামর্থ্য ছিল না। এই ঘটনার পর থেকে উইলিয়াম্ জুয়াখেলা একেবারে ছেড়ে দিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি মা, বোন্ এবং আইজাক্ মিল্‌নার্ (Isac Milner) নামক এক ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে ইউরোপ-ভ্রমণে বেরুলেন। এই ভ্রমণকালে ধর্ম্মযাজক মিল্‌নারের সংসর্গে ধীরে ধীরে উইল্‌বার্‌ফোর্স্ ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হতে লাগ্‌লেন। সংসারের প্রতি তাঁর আর কোন মোহ থাক্‌ল না।

লণ্ডনে ফিরে এসে উইলিয়াম রেভারেণ্ড্ জন্ নিউটনের সংস্পর্শে এলেন। নিউটনের মধ্যস্থতায় তিনি প্রথমতঃ মিস্ হান্না মূর্ এবং পরে টমাস্ ক্লার্কসনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। এই ক্লার্কসন ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদের জন্য একটি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী।

কিছুদিন ধ'রে উইলিয়ামের মাথায় এই ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের কথা ঘুরতে লাগ্‌ল। অবশেষে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে পিটের পল্লী-ভবন হল্‌উড্‌ পার্কে একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উইল্‌বার্‌ফোর্স প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন যে ক্রীতদাস ব্যবসায়ের মত অমানুষিক প্রথার উচ্ছেদ সাধন করতে না পারলে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ

পিটের পল্লীভবনে দাঁড়িয়ে উইল্‌বার্‌ফোর্স্‌

কর্‌বেন না। ডাঃ জন্‌সনের বন্ধু বেনেট্‌ ল্যাংটনের প্রদত্ত এক ভোজসভায় তিনি তাঁর এই প্রতিজ্ঞার কথা প্রথম বাইরের জগতের কাছে প্রচার কর্‌লেন।

মনস্থির করার পর উইলিয়াম্ দাস-ব্যবসায় সম্বন্ধে সবকিছু জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠ্‌লেন। তিনি দাস-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, দাস-ব্যবসায়ী জাহাজের কাপ্তেনদের সঙ্গে দেখা করতে লাগ্‌লেন। প্রত্যেকেই তাঁর মধুর ব্যবহারে এবং মধুর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগ্‌ল।

প্রতি সপ্তাহে গ্রেন্‌ভিল্ শার্প, জেম্‌স্, র‍্যাম্‌সে, টমাস্ ক্লার্কসন্ প্রভৃতি উইলিয়ামের সহকর্ম্মীরা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ঠিক যে সময় তিনি এই দাস-ব্যবসায়ের প্রশ্ন হাউস অফ কমন্সে তুলবেন ব'লে মনস্থ করলেন, সেই সময় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েকমাস ধ'রে তাঁর জীবনের আশাই সকলে ছেড়ে দিল। ডাক্তাররা যখন কিছুই করতে পারলে না, তখন তিনি নিজে অল্প অল্প আফিম খাওয়া অভ্যাস করলেন এবং এর ফলে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে উইলবারফোর্স দাস-ব্যবসায়ের নিন্দা করে ১২টি প্রস্তাব আইন-সভায় আন্‌লেন—সেদিন তিনি সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে এক দার্ঘ বক্তৃতা দিলেন। পিট্, বার্ক, ফক্স প্রভৃতি তৎকালীন বড় বড় চিন্তাশীল নেতাদের সমর্থন পেয়েও তাঁর প্রস্তাব ভোটে টিক্‌ল না। বছরের পর বছর তিনি দাসপ্রথা-নিবারণী আইন প্রণয়নের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি কৃতকার্য্য হতে পারছিলেন না। এই সময়ে ইউরোপে আরও কয়েকটি বড় বড় রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেওয়ায়, তাঁর প্রস্তাবের দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর কেউ

পাচ্ছিল না। প্রথমতঃ ফরাসীবিদ্রোহ এবং দ্বিতীয়তঃ নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ে সমস্ত ইউরোপ ছিল সশঙ্ক। এই সব নানা কারণে কিছুদিনের জন্য উইল্‌বারফোর্সের মহতী প্রচেষ্টায় সাড়া পাওয়া গেল না।

অবশেষে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লর্ডস্‌দের সভায় দাসপ্রথা নিবারণের জন্য একটি বিল উপস্থিত করা হ'ল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী হাউস্ অফ্ কমন্সে এর সম্বন্ধে আলোচনা হয়ে গেল। যখন ভোট গ্রহণ করা হ'ল, তখন দেখা গেল যে বিলটির পক্ষে ভোটের সংখ্যা ২৮৩ এবং বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা মাত্র ১৬। ২৫শে মার্চ্চ সম্রাট্ তাঁর সম্মতি দিলেন—দাসপ্রথা-নিবারণী বিল তখন আইনে পরিণত হয়ে গেল। বছরের পর বছর ধ'রে উইলবারফোর্স্ যে জন্য চেষ্টা করছিলেন আজ তা সফল হ'ল। আইন পাশ হবার পর তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন: "এখন আমরা কিসের বিরুদ্ধে অভিযান করব।" এর পর যদিও তিনি ২৬ বছর বেঁচেছিলেন—তবুও তাঁর জীবনে এরূপ সফলতা আর আসেনি। দাসপ্রথা-নিবারণী আইন পাশ হবার ফলে তাঁর দেশবাসিরা তাঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করতে লাগলেন। স্বদেশবাসিদের উপর তখন তাঁর অপরিসীম প্রভাব।

এর পর তিনি পুরোদস্তুর বিশ্বপ্রেমিক হয়ে পড়লেন। কোন বিপদে পড়লেই বা কোনরূপ অত্যাচারিত হলেই লোকে ত্রাণকর্ত্তা ভেবে তাঁর কাছেই ছুটে আসৃত। তিনিও নির্ব্বিচারে সকল সাহায্য করতেন। তাঁর কাজ এত বেড়ে গেল যে, তিনি বিশ্রামের সময় পর্য্যন্ত পেতেন না।

ইংলণ্ডে দাসপ্রথা নিবারণ ক'রেই কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হলেন না—সারা পৃথিবী থেকে যাতে দাস-ব্যবসায় উঠে যায় তিনি তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। বিভিন্ন দেশের রাজা এবং রাষ্ট্রনায়কদের কাছে তিনি তাঁর আবেদন লিপি পাঠাতে লাগ্‌লেন। এতে ফল অবশ্য খুব হচ্ছিল না।

তিনি সাধারণের উপকারের জন্যই জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিলেন। দিনরাত তাঁর উপর এত কাজের চাপ থাকায় তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়েই চল্‌ল! ফলে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সাধারণের কার্য্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। লণ্ডন থেকে ১০ মাইল দূরে হাইউড হিল্‌ নামে ছোট একটি ষ্টেট্‌-তিনি কিনলেন। কর্ম্মব্যস্ত জীবনে অবসর আসায় তিনি আনন্দে ব'লে উঠেছিলেন, "আমি আর এখন রাষ্ট্রনৈতিক নেতা নই!" বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করলেও মনে তাঁর দুঃখও বড় কম ছিল না। নিরন্তর ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে অলস জীবন যাপন মাঝে মাঝে তাঁকে অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌ত। তাই তিনি অনুশোচনা ক'রে বল্‌তেন, "আমি এখন হুল-বিহীন মৌমাছি! বিগত জীবনের কর্ম্মবহুলতার কথা তাঁর মনে পড়্‌ত।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে উইল্‌বারফোর্সকে লণ্ডনে নিয়ে আসা হ'ল। তিনি তখন মৃত্যু-শয্যায়। বন্ধুরা সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি তাঁদের বল্‌লেন: "আমার অবস্থা এখন ঠিক ভাঙ্গা ঘড়ির মতন।" ২৫শে জুলাই হাউস অফ্‌ কমন্সে আর একটি বিল পাশ হ'ল—এর ফলে ব্রিটিশ-অধিকৃত ওয়েষ্টইণ্ডিজ্‌ (West

Indies) প্রভৃতি উপনিবেশ থেকে দাস-প্রথা উঠে গেল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে এর জন্য দুই কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাস-ব্যবসায়ীদের দিতে হ'ল।

মৃত্যু শয্যায় উইল্‌বারফোর্স্‌কে এ খবর দেওয়া হ'ল— কারণ এই খবর শোনার জন্য তিনি লণ্ডনে এসেছিলেন। খবর শুনে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন: ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমার মাতৃভূমি ইংলণ্ড আজ দাস-ব্যবসায় নিবারণের জন্য দুই কোটি পাউণ্ড ক্ষতি স্বীকার করেছে এবং এই শুভদিন আমার জীবিতাবস্থায়ই এসেছে!" ২৯শে জুলাই রাত্রিবেলা তাঁর মৃত্যু হ'ল। এর ঠিক এক বছর পরে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৩১ শে জুলাই মধ্যরাত্রে ৮লক্ষ ক্রীতদাস মুক্তি পেল। পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হ'ল। সেদিন রাত্রে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের কি আনন্দোৎসব! আজ যে পৃথিবীর সমস্ত ক্রীতদাস মুক্তি পেয়েছে—এর জন্য সমস্ত প্রশংসা মহাপ্রাণ উইলিয়াম্ উইল্‌বার্‌ফোর্স্‌েরই প্রাপ্য। তিনি ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী পথপ্রদর্শক। এই বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষের দৈহিক মৃত্যু ঘটেছে বটে, কিন্তু সহস্র সহস্র নরনারীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আজিও তিনি বেঁচে আছেন। মৃত্যুর পরে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সমাধিস্থল ওয়েষ্টমিনিষ্টার্ এ্যাবিতে পিট্, ফক্স প্রভৃতি তাঁর সহকর্ম্মিদের পাশেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। এই অক্লান্ত-কর্ম্মা আত্মত্যাগী মহাপুরুষের স্মৃতি জগৎ কখনো ভুল্‌বে না। পৃথিবার সভ্যতার ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাক্‌বে।

রূপকথার রাজা

ইউরোপের ডেন্‌মার্ক দেশের নাম তোমরা অনেকেই হয় ত শুনেছ। ডেনমার্কে ফুনেন্‌ নামে একটি ছোট্ট দ্বীপে ওডেন্স (Odense) নামে একটি ছোট্ট সহর আছে। এইখানে, এই ওডেন্স সহরে একটি ছোট ঘরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ছোট একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল। এই ছেলেটি পরে বড় হয়ে জগতের শিশুদের যত আনন্দ দিয়াছে, আর কেউ বোধ হয় তত দিতে পারেনি। তোমরা কেউ কেউ হয় ত তাঁর নাম শুনেছ,—অনেকে হয় ত তাঁর চমৎকার পরীর গল্প এবং রূপকথাও পড়েছ। তাঁর নাম হ্যান্স এণ্ডারসেন (Hans Andersen)।

তিনি ছিলেন জগতের শিশু-সাহিত্যের লেখক'দর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই তাঁকে "গল্প-লেখকদের রাজা" বা "The Prince of Story-Tellers" বলা হয়। হ্যান্স এণ্ডারসেনের নিজের জীবনও পরীর গল্পের মত অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য জনক। চেষ্টা এবং অধ্যবসায় থাক্‌লে মানুষ কিরূপ উন্নতি করতে পারে—তা আমরা হ্যান্সের জীবনী থেকে বুঝাতে পারি। তিনি অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মেছিলেন—তাঁর বাবা মুচির কাজ করতেন। তাঁদের একখানা মাত্র ঘর ছিল—সেই ঘরে তাঁরা খাওয়া শোওয়া প্রভৃতি সব কাজই করতেন। কিন্তু শিশু হ্যান্সের মনে এজন্য কোন দুঃখ ছিল না—তিনি তাঁদের ছোট বাড়ীটিকে খুবই ভালবাস্‌তেন। তাঁদের ছাদের উপর

জলের নালার কাছে একটা বড় বাক্সে ভর্ত্তি করে, তাঁর মা শাকসবজীর চাষ করতেন। হ্যান্সের "তুষার রাণী" বা "Snow Queen" নামক গল্পে তাঁর মা'র এই বাগানের সুন্দর বর্ণনা আছে। তোমরা হ্যান্সের গল্প প'ড়ে দেখ—তবেই বুঝতে পারবে।
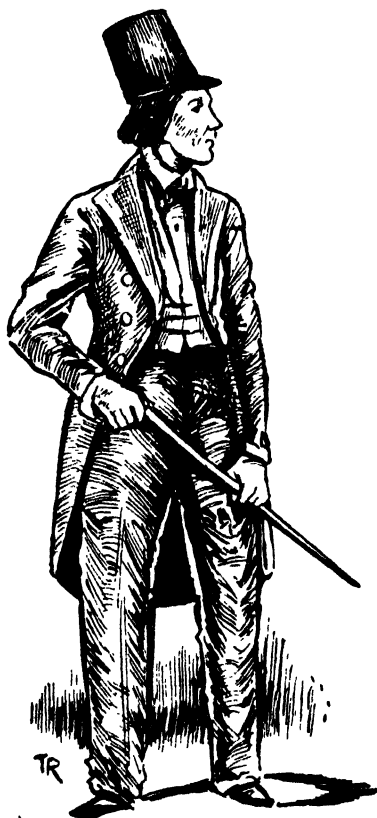
হ্যান্স্ এণ্ডারসেন্

হ্যান্সের বাবা খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন—এবং তিনি পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাস্তেন। রবিবার দিন তাঁকে কাজ করতে হ'ত না—কারণ সেদিন বিশ্রামের দিন। তাই সেদিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গ্রামের দৃশ্য উপভোগ ক'রে বেড়াতেন। তাঁর কয়েকখানা বই ছিল—সেই বই থেকে সময় সময় তিনি পুত্রকে প'ড়ে শোনাতেন। সময় সময় তিনি পুতুল দিয়ে ছেলের জন্য কৃত্রিম থিয়েটার ক'রে দিতেন। এমনি ক'রে শিশু হ্যান্সের দিন কাটত।

হ্যান্স্ যখন একটু বড় হলেন—তখন তাঁর বাবা তাঁকে সঙ্গে ক'রে দুই একদিন থিয়েটারে নিয়ে যেতেন।

এই থিয়েটার দেখা শিশু হ্যান্সের মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার ক'রে বস্‌ল যে তাঁর মাঝে মাঝে থিয়েটারে যেতে ইচ্ছে হত, কিন্তু তাঁদের এমন কোন আয় ছিল না যে তিনি প্রায়ই থিয়েটারে যান। তাই উপায়ান্তর না দেখে, যে লোকটা থিয়েটারের বিজ্ঞাপন বিলি কর্‌ত, তার কাছ থেকে একখানা বিজ্ঞাপন তিনি চেয়ে নিতেন এবং ঘরের কোণে ব'সে নাটকের নাম অনুসারে নিজেই একটা নাটক রচনা কর্‌তেন—আর ছোট পুতুলগুলি সেই নাটকের অভিনয় করত, অল্প বয়সে হ্যান্সের বাবার মৃত্যু হ'ল—শিশু হ্যান্স্ যেন একেবারে একা বোধ করতে লাগ্‌লেন। তিনি ঘরে ব'সে একা একা পুতুলের অভিনয় করতেন। তাঁর গলা ছিল খুব সুন্দর—তিনি যেমন চমৎকার আবৃত্তি করতে পারতেন তেমনি চমৎকার গান করতে পারতেন। তাই তাঁদের ছোট সহরে তাঁর একটু নামডাক হ'ল—ধনী ব্যক্তিরা সময় সময় তাঁকে ডেকে তাঁর গান এবং আবৃত্তি শুন্‌তেন।

কিন্তু পাড়ার লোকেরা শিশু হ্যান্সকে বুঝ্‌তে পারত না—তারা তাঁর এই অদ্ভুত জীবনযাপন নিয়ে পরিহাস করত। প্রতিবেশিরা সকলে মিলে হ্যান্সের মাকে উপদেশ দিতে লাগ্‌ল: "তোমার ছেলে বড় হ'ল—ওকে কাজে লাগিয়ে দাও। যা দুপয়সা আন্‌তে পারে, আনুক্।" কিছুদিনের জন্য হ্যান্স্ একটা স্কুলে গেলেন—কিন্তু সেখানে টেকা তাঁর পক্ষে

অসম্ভব হয়ে উঠ্‌ল। ছেলেরা তাঁকে দেখ্‌লেই চীৎকার ক'রে উঠত: "ঐ যে নাট্যকার যায়!" বেচারী হ্যান্স্‌ এ উপহাস সহ্য করতে না পেরে ঘরের কোণে ব'সে বহুক্ষণ কাঁদতেন। হ্যান্সের মা দেখলেন যে ছেলের বয়স চৌদ্দ হয়ে গেছে—তাই তিনি কাজ শেখার জন্য ছেলেকে এক দর্জ্জির কাছে রাখতে চাইলেন। কিন্তু হ্যান্সের এটা ভাল লাগল না। তাঁর ইচ্ছা তিনি কোপেনহ্যাগেনে (ডেন্‌মার্কের রাজধানী) যান। তাঁর মনে বিশ্বাস ছিল যে কোপেন্‌হ্যাগেন্‌ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর।

তাঁর মা জিজ্ঞেস করলেন: "রাজধানীতে গিয়ে কি করবে?" বালক হ্যান্স্‌ উত্তর দিলেন: "আমি প্রসিদ্ধ হব। মানুষ প্রথমে দুঃখ কষ্ট পায়—তারপর সে প্রসিদ্ধ হয়।" হ্যান্সের মা প্রথমে কিছুতেই সম্মতি দেবেন না—পরে হ্যান্স খুব কান্নাকাটি করাতে তিনি তাঁর রাজধানী যাওয়া অনুমোদন করতে বাধ্য হলেন। পাড়ার লোকেরা মনে করল যে এতটুকু ছেলেকে যে মা রাজধানীতে একা পাঠায় তার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে!

হ্যান্সের মনে দৃঢ়সঙ্কল্প যে তিনি অভিনেতা হবেন; বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য ক'রে তিনি যখন কোপেন্‌হ্যাগেনে পৌঁছিলেন, তখন তাঁকে নিরাশ হতে হ'ল। কোনও থিয়েটার কোম্পানীই তাঁর মত বালক-অভিনেতা চায় না। হ্যান্সের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পড়ল। অপরিচিত রাজধানীতে খাদ্যের অভাবে তাঁর বুঝি মৃত্যু হয়। বহুকষ্টে তিনি একজন কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট করলেন। সেই কবি তাঁকে আশ্রয় দিলেন। এইখানে

তিনি কিছুদিন থাক্‌লেন। তখনও তিনি নাটক রচনা করতেন এবং পুতুলগুলিকে পোষাক পরিয়ে সেই নাটক অভিনয় করাতেন। এই সময় তিনি বহু লোকের সঙ্গে পরিচিত হলেন—পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁকে একদিন কবি ব'লে ডাকাতে হ্যান্সের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প হ'ল যে তিনি লেখক হবেন। তিনি তাই নাটক এবং কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন নূতন উদ্যমে। এই সময়ে তাঁর আশ্রয়দাতা কবির চেষ্টায় তিনি কোপেন্‌-হ্যাগেনের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হলেন, তাঁর নাম কলিন্ (Collin)। কলিন্ হ্যান্সের লেখার মধ্যে স্থানে স্থানে প্রতিভার স্পর্শ দেখতে পেলেন—কিন্তু এ কথাটাও তিনি ভাল ক'রে বুঝলেন যে ভাল লেখাপড়া না শিখলে এ প্রতিভা কোনও কাজে লাগবে না। তাই তিনি চেষ্টা ক'রে হ্যান্সের জন্য রাজার কাছ থেকে একটা বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

নূতন ক'রে হ্যান্স এণ্ডারসেনের জীবন আরম্ভ হ'ল...অত্যন্ত ধৈর্য্য এবং পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি লেখাপড়া করতে লাগলেন। তিনি শীঘ্রই খুব উন্নতি করলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। হ্যান্সের সোনার স্বপ্ন বুঝি সফল হ'তে চল্‌ল। চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁর মনোভাব তাঁর নিজের কথায় শোনঃ "আমি এখন অত্যন্ত সুখী। আমার একটু কবিখ্যাতিও হয়েছে। রাজধানীর সমস্ত গৃহে আজ আমার সাদর অভ্যর্থনা। আমি পড়াশুনা ক'রে পরীক্ষা পাশ করছি এবং আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতার বইখানিরও যথেষ্ট আদর হয়েছে। আমার মনে হয় সম্মুখে যেন আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে।"

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজসরকার থেকে তিনি একটা ভ্রমণের বৃত্তি লাভ করলেন। এই বৃত্তির সাহায্যে ইউরোপের বহুদেশ তিনি বেড়িয়ে এলেন। ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে তিনি তিনখানা উপন্যাস প্রকাশিত করলেন। জার্ম্মেনী ও অন্যান্য দেশে উপন্যাস তিনখানার খুব আদর হ'ল কিন্তু বহুদিন যাবৎ ডেনমার্কে এর বিরুদ্ধ সমালোচনা চল্‌তে লাগল। এতে হ্যান্সের মনে খুব আঘাত লাগল—তাঁর স্বদেশবাসীরা যে এখনও তাঁকে সাহিত্যিক ব'লে স্বীকার করবে না—এটা কি কম দুঃখের কথা!

এই সময় বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায় তিনি রাজসরকার থেকে একটা বার্ষিক বৃত্তি লাভ করলেন। এই বৃত্তির সাহায্যে তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীন জীবন যাপন করতে লাগলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্যচর্চ্চা করতে লাগলেন। কোপেন্‌হ্যাগেনে প্রত্যেক গৃহে আজ তাঁর সম্মান, তাঁর মধুর নিঃস্বার্থ প্রকৃতির গুণে তিনি সকলের প্রিয় হয়ে উঠলেন। উপন্যাস প্রকাশের কয়েক মাস পরেই তিনি শিশুদের জন্য একখানা চমৎকার রূপকথার বই প্রকাশিত করলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন—চমৎকার উপন্যাস হ্যান্স লিখতে পারতেন, তিনি কোন্ দুঃখে ছেলেমানুষী পরীর গল্প লিখতে গেলেন, একথা বন্ধুরা কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না। এই তিরস্কারে নিরুৎসাহ হয়ে তিনি পরীর গল্প লেখা হয়ত ছেড়েই দিতেন কিন্তু তার উপায় ছিল না। আপনা থেকে এসব গল্প তাঁর মনে উঠত, তিনি কিছুতেই না লিখে পারতেন না।

আমাদের পক্ষে এতে খুব ভালই হয়েছে। তিনি লেখা ছেড়ে দিলে আজ আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর রূপকথা পেতাম না!

হ্যান্সের গল্প আজ সব জায়গায় পড়া হচ্ছে—ছেলে বুড়ো সকলেই তাঁর গল্প প'ড়ে প্রশংসা কর্‌ছেন। হ্যান্সের বয়স এখন ৪০ বৎসর। আর এই হ্যান্সই একদিন পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে জীর্ণবস্ত্রে কোপেন্‌হ্যাগেনে প্রবেশ করেছিলেন। আর আজ? আজ তিনি ডেন্‌মার্কের রাজরাণীর অতিথি হ'য়ে এক টেবিলে বসে ভোজ খাচ্ছেন। এটা কি রূপকথার মত নয়? পাড়ার এবং স্কুলের যে সব ছেলেমেয়েরা হ্যান্স্‌কে উপহাস কর্‌ত, তারা আজ সেই হ্যান্স্‌ এণ্ডারসেন্‌কে রাজরাণীর সঙ্গে রাজবাড়ীতে ভোজ খেতে দেখ্‌লে, নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস কর্‌বে কি?

কিন্তু ভাগ্যের এই পরিবর্ত্তনে হ্যান্স্‌ এণ্ডারসেন্‌ তাঁর স্বভাবগত মধুর এবং বিনীত চরিত্র হারাননি। তিনি চিরকাল ভগবানে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। লোকে তাঁকে সম্মান দেখাত, তিনি গর্ব্বিত না হয়ে, অনেক সময় ভাবতেন, হয় ত তিনি এ সম্মানের উপযুক্ত নন!

ভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না—তাই জীবনে ইউরোপের বহুদেশে বহুবার ভ্রমণ করেছেন। ছেলেদের কত প্রিয় ছিলেন এবং তাদের মনের উপর তাঁর কতটা অধিকার ছিল এ সম্বন্ধে একটা গল্প ব'লেই বর্ত্তমানে প্রবন্ধ শেষ কর্‌ব। একবার তিনি ও তাঁর এক বন্ধু থিয়েটার দেখ্‌তে যাচ্ছেন। পথে বন্ধুর অনুরোধে এক বাড়ীতে কয়েক মিনিটের জন্য তিনি উঠ্‌তে বাধ্য হন। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা

যেই হ্যান্স্ এণ্ডারসেনের নাম শুন্‌তে পেল, তখনই এসে তাঁকে ঘিরে বস্‌ল। সকলের মুখে এক কথা "একটা গল্প বলুন।" হ্যান্সের কিন্তু গল্প বল্‌বার সময় নেই—তাঁর থিয়েটারের সময় হ'য়ে গেছে। তবু তাঁকে গল্প বলতে হ'ল—শিশুরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাদের অনুরোধ তিনি কি ক'রে এড়াবেন? কাজেই তাঁকে গল্প বলতে হ'ল। গল্প শেষ ক'রে বন্ধু ও তিনি যখন থিয়েটারে গেলেন, তখন দেখেন যে বহুক্ষণ থিয়েটার আরম্ভ হ'য়ে গেছে। আর একবার তিনি যখন একটি বাড়ী থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, তখন এরিক্ নামে ছোট্ট একটি ছেলে কেঁদেই আকুল। ও কিছুতেই হ্যান্সকে যেতে দেবে না। অবশেষে হ্যান্স্‌কে বিদায় নিতে হ'ল—বিদায়ের সময় এরিক্ তার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় দুইটি মাত্র পুতুলের, একটি হ্যান্স্‌কে বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ প্রদান কর্‌ল। বহুদিন হ্যান্স্ এই পুতুলটি সযত্নে নিজের কাছে রেখেছিলেন। বহুরকম সুখ দুঃখ তাঁর জীবনে এসেছিল কিন্তু হৃদয়ে তিনি ছিলেন শিশুর মত সরল, অকপট এবং মধুরভাবাপন্ন। সেইজন্যই সকলে যে তাঁকে ভালবাস্‌ত, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে অক্লান্তকর্ম্মী এই মহাপুরুষ শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু আজ তাঁর আত্মা জগতের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বিধান কর্‌ছে। এখনও তাঁর রূপকথার মধ্যে তাঁর শিশুর মত সরল সুন্দর মনটির দেখা পাওয়া যায়।

রবার্ট লুই ষ্টিভেন্সন

আজ যাঁর জীবনী শোনাব তাঁর নাম রবার্ট লুই ষ্টিভেন্সন্ (Robert Luis Stevenson)। এ নামটির সঙ্গে তোমাদের খুব বেশী পরিচয় না থাকলেও ইংরেজ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এ নামটির পরিচয় খুব অল্প বয়েস থেকেই। দি চাইল্ড্স্ গার্ডেন্ অব্ ভার্স (The Childs' Garden of Verse), ট্রেজার আয়ল্যাণ্ড্ (Treasure Island), ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড্ (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), এব্ টাইড্ (Ebb Tide) প্রভৃতি যে সব বই তিনি লিখে গেছেন, তাতে জগতের শিশু-সাহিত্যে তাঁর নাম অমর হ'য়ে আছে।

তোমরা কেউ কেউ হয় ত তাঁর ট্রেজার আয়ল্যাণ্ড্, ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড্, এব্ টাইড্ প্রভৃতি বই সিনেমায় দেখেছ। যদি দেখে থাক, তবে বুঝতে পারবে চমৎকার রহস্যময়ভাবে গল্প বল্‌বার কি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এই লোকটির! ষ্টিভেন্সনের জীবনীও ছিল অদ্ভুত চমকপ্রদ; ছোটবেলা থেকে তিনি খুব রোগা ছিলেন—সারাজীবন তিনি অসুখে ভুগেছিলেন—অথচ কি দুঃসাহসী মনোবৃত্তি ছিল তাঁর! এই রুগ্ন শরীরেই তিনি সারাজীবন দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করেছিলেন। দেখ্‌তে তিনি ছিলেন রোগা—পাগুলো ছিল সরু সরু—অথচ তাঁর বড় বড় ধূসর চোখে ছিল তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি। রুগ্ন শরীরে সারাজীবন তিনি হেসেই কাটিয়েছিলেন।

অসুখের জন্য অনেক সময় তাঁকে ডাক্তারের আদেশে চুপ ক'রে সারাদিন বিছানায় কাটাতে হ'ত—এমন কি দিনের বেলায় তাঁর কথা বলা পর্য্যন্ত অনেক সময় নিষিদ্ধ থাকৃত। তিনি সারাদিন বিছানায় ব'সে ব'সে দুঃসাহসপূর্ণ রোমাঞ্চকর

শিশু রবার্ট লুই ষ্টিভেন্সন

গল্প লিখ্‌তেন। সন্ধ্যার সময় তিনি বিছানা থেকে নেমে আস্‌তেন—তাঁর সমস্ত মুখ হাসিতে উজ্জ্বল। [illegible] গল্পে

তিনি ঘরের আবহাওয়াই বদ্‌লে দিতেন। তারপর সারাদিন ধ'রে তিনি যে গল্প লিখ্‌তেন তাঁর পরিবারের সবাইকে সে গল্প প'ড়ে শোনাতেন। এই চিররোগা মানুষটিই যে এমন দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর গল্প লিখে গেছেন, তা আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় ষ্টিভেন্সনের জন্ম হয়েছিল। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কবিতার বই 'দি চাইল্ডস্ গার্ডেন অব্ ভার্স'এ তাঁর ছোটবেলার অনেক গল্প মধুর কবিতায় লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল না থাক্‌লেও তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল খুব প্রবল। তিনি ছেলেবেলায় নিজেকে অনেক সময় সৈন্য, অনেক সময় বা জলদস্যুরূপে কল্পনা করতেন। এমনি কল্পনা ক'রে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। ছোটবেলায় কল্পনায় তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র বেড়িয়ে বেড়াতেন—তাই দেখি, বড় হ'য়ে তিনি সত্যই একজন বড় ভ্রমণকারী হয়েছিলেন। শৈশবে অনেক সময় তাঁকে বিছানায় বন্দী হয়ে থাকতে হ'ত—ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ-যে কত বড় শাস্তি তা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুতেই দম্‌তেন না। তিনি কল্পনার সাহায্যে তাঁর বিছানাকে মনে কর্‌তেন সমুদ্র, আর নিজেকে মনে কর্‌তেন দুঃসাহসী নাবিক। অনেক সময় নিজেকে মনে কর্‌তেন একটি মস্ত বড় দৈত্য আর বালিশগুলো দিয়ে তৈরী করতেন পাহাড়।

বড় হয়ে তিনি তাঁর শৈশবের এই সব অভিজ্ঞতা সুন্দর ভাবে লিখে রেখে গেছেন। তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল: তাঁর

লেখা পড়লে মনে হয় যে, একটি শিশুর মুখে তার অভিজ্ঞতার কথা শুন্‌ছি। শৈশবের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়েই তিনি শৈশবের ঘটনাগুলি দেখ্‌তে পেতেন। অনেক শিশু-সাহিত্যিকের মধ্যে এই ক্ষমতাটি থাকে না। ষ্টিভেন্সনের এই অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল ব'লেই তিনি এত চমৎকার ক'রে তার ছোটবেলার গল্প বল্‌তে পেরেছেন। যখন বড় হয়েছিলেন তখনও ষ্টিভেন্সন্ তাঁর শৈশবের সরল-বিশ্বাসী এবং সদাপ্রফুল্ল মনোভাব ত্যাগ করেন নি। চিরদিন তাঁর মন ছিল শিশুর মত কোমল। তাঁর ভঙ্গুর দেহটা অনেক আগেই বুড়ো হ'য়ে গেছিল বটে, কিন্তু তাঁর মন ছিল চিরসবুজ, চিরতরুণ। যখনই তাঁর শরীর একটু ভাল থাক্‌ত, তখনই তিনি ঠিক ছোট ছেলের মত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রসিকতা করতে ছুটোছুটি করতে ভালবাস্‌তেন। এমন কি তাঁর বড়দের জন্যে লেখা বইগুলিতেও আমরা খুব বেশী খেলা এবং পুতুলের কথা দেখ্‌তে পাই—দেখে মনে হয় যে, তিনি বোধ হয় ছোট ছেলের মত সব সময় এই সবের কথাই ভাবতেন। নতুন কিছু শেখার, নতুন দেশ দেখার, আগ্রহ ছিল তাঁর ঠিক ছোট ছেলেমেয়েদের মতই।

সতের বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁর এই সময়ের জীবন সম্বন্ধে তিনে লিখে গেছেন: "আমার শৈশবে এবং যৌবনে আমি 'কুঁড়ের বাদশা' ব'লে প্রসিদ্ধ ছিলাম। আমি কিন্তু আমার ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত ছিলাম—আমি সাহিত্যরচনা অভ্যাস ক'রেছিলাম।"

ষ্টিভেন্সনের বাবা, ঠাকুরদাদা প্রভৃতি সবাই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, অনেক বড় বড় বাতি-ঘর এবং পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ ক'রে তাঁরা প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তাঁর বাবা আশা করেছিলেন যে, বড় হয়ে লুইও ইঞ্জিনিয়ার হবে। কিন্তু লুইয়ের এ বিষয়ে কোনই আগ্রহ ছিল না। তিনি নিজে এ বিষয়ে কি বলছেন শোন: "আমাকে ইঞ্জিনিয়ার করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল; আমি পোতাশ্রয় এবং বাতি ঘর নির্ম্মাণের কাজ করেছিলাম। তা ছাড়া কিছুদিন এক মিস্ত্রির কাছে এবং একটি পিতলের কারখানায়ও কাজ শিখেছিলাম। তারপর এক ভয়ঙ্কর দিনে সান্ধ্যভ্রমণের সময় আমি কঠিন প্রশ্নের চাপে প'ড়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলাম যে, সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। আমার বাবা বল্লেন যে, সাহিত্য ত আমার পেশা নয়---তবে আমি যদি পচ্ছন্দ করি, তবে আইন পড়তে পারি। কাজেই একুশ বছর বয়সে আবার আইন পড়া সুরু করলাম।" পঁচিশ বছর বয়সে তিনি সসম্মানে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সাহিত্যসাধনা করছিলেন। তাঁর আজন্ম সাধনার ফলেই আমরা তাঁর কাছ থেকে এত সুন্দর সুন্দর বই পেয়েছি। বহু সাধনা ক'রে তিনি বাণীর কৃপা লাভ করে-ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি পরে লিখেছেন: "নিজের লেখা আমার নিজেরই ভাল লাগে না। আমি লিখতে ভাল-বাসতাম বটে, কিন্তু লেখা হ'য়ে গেলে দেখতাম যে, সেগুলো বাজে হয়েছে কাজেই বন্ধু বান্ধবদের সে সব লেখা দেখাতাম

না···তখনও আমি লিখতে শিখিনি—আমি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমাকে বেঁচে থাক্‌তেই হবে এবং লেখাও শিখতে হবে।” ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম একখানা প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশ করলেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ হ'ল; সাহিত্য সাধনায় জীবনে তিনি কৃতকার্য্যতা লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু সে অতি ধীরে ধীরে—বহু প্রচেষ্টার ফলে।

তিনি কিছুদিনের জন্য বেলজিয়ামে এবং সেভিন্নেসে ভ্রমণ করলেন—এই ভ্রমণ-কাহিনী অবলম্বন ক'রে তাঁর ছুখানি সুন্দর বই রচিত হ'ল। এ সময় ছুএকটি সাময়িক পত্রিকায়ও তিনি লিখ্‌ছিলেন—এর ফলে তাঁর যশ বাড়্‌ছিল বটে, কিন্তু টাকা পয়সা আস্‌ছিল কম। যখন তিনি ফরাসী দেশ ভ্রমণ করছিলেন, তখন একটি আমেরিকান মেয়েকে তিনি ভাল-বেসেছিলেন। মেয়েটি যখন তার স্বদেশ কালিফোর্ণিয়ায় ফিরে গেল, তখন লুই ষ্টিভেন্সনও আমেরিকায় রওনা হলেন। পথে জাহাজে তাঁর খুব কষ্ট হ'ল, ফলে তাঁর স্বাস্থ্য খুব খারাপ হ'য়ে পড়ল। অবশেষে সহায়হীন, অর্থহীন অবস্থায় তিনি আমেরিকায় এসে পৌঁছলেন। আমেরিকায় অনেকদিন তাঁকে না খেয়ে কাটাতে হয়েছিল। তিনি কালিফোর্ণিয়ার উপস্থিত হ'য়ে সেই মেয়েটিকে বিয়ে করলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি সেই রৌদ্রোজ্জ্বল কালিফোর্ণিয়ায় বাস করতে লাগলেন। এসময় তিনি বিশেষ সুস্থ ছিলেন না—অথচ সব সময় তাঁর মুখে হাসি লেগে থাক্‌ত। একমুহূর্ত্তের জন্যও

তাঁকে বিষণ্ণ দেখা যেত না। তিনি জীবনে কখনও তাঁর বন্ধুবান্ধবকে নিজের খারাপ স্বাস্থ্যের কথা বলতেন না, কিংবা তাঁদের সামনে বিষণ্ণভাব দেখাতেন না। জগতের সামনে তিনি, তাঁর সাহসী, প্রফুল্ল, সদাহাস্যময় মুখ তুলে ধরতে ভালবাস্‌তেন। নিজে সুখে থাকি বা না থাকি, পরকে সুখী করা, অন্যকে আনন্দ দান করাই তিনি তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ব'লে মনে করতেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: "আমরা জীবনে সুখী হবার কর্ত্তব্যকে যত অবহেলা করি—তত আর কিছুকে নয়। একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট দেখতে পাওয়ার চেয়ে একজন সুখী পুরুষ বা স্ত্রীলোকের মুখ দেখতে পাওয়া ঢের বেশী ভাল। এরকম একজন লোক ঘরে ঢুক্‌লে মনে হয় যে, ঘরে বুঝি আরেকটি মোমবাতি জ্বলে উঠল!" জগতের সব জিনিষ তিনি ভালবাস্‌তেন এবং তিনি ছিলেন একেবারে নিঃস্বার্থ; ধন যশ প্রভৃতি পার্থিব কোন জিনিষের ওপর তাঁর মোহ ছিল না। তাই সর্ব্বদা রোগ শোক সত্ত্বেও তিনি হাসিমুখে জীবন কাটিয়ে গেছেন। বেশীদিন একস্থানে থাক্‌লে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল থাকৃত না—তাই তিনি ছিলেন সদা ভ্রাম্যমাণ। কালিফোর্ণিয়া থেকে তিনি সস্ত্রীক ফিরে এলেন স্বদেশ স্কটল্যাণ্ডে—আবার সেখান থেকে গেলেন সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড়ে অবস্থিত সুন্দর ড্যাভোসে—আবার সেখান থেকে ফিরে এলেন স্কটল্যাণ্ডে। স্কটল্যাণ্ডের অতিরিক্ত শীতে তাঁর শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হ'য়ে পড়ল। বেশীর ভাগ সময় তিনি বিছানায়ই বন্দী থাক্‌তেন, কিন্তু তার লেখার বিরাম

ছিল না। এই সময় তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ গল্পের বই 'ট্রেজার আয়ল্যাণ্ড' রচনা করলেন। আবার শীঘ্রই তিনি ড্যাভোস্, হায়ারেস্, নাইস্ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া বদ্‌লাতে গেলেন। এই সময় মাঝে মাঝে তাঁর শরীর এত খারাপ হ'য়ে পড়ত যে, তিনি মাসের পর মাস কলম ধরতেই পারতেন না।

এত দুর্ব্বল অসুস্থ লোকটিকে এত হাসিমুখে নিষ্ঠুর নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখলে আমাদের করুণাও হয় আনন্দও হয়। সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে একমাত্র মানসিক বলেই তিনি এগিয়ে চল্‌লেন। তাঁর এই অদ্ভুত মানসিক শক্তি দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যাই। তিনি ইংলণ্ডে ফিরে এসে তাঁর কবিতার বই 'দি চাইল্ডস গার্ডেন অব ভার্স' লিখ্‌ছেন—এর পরেই তাঁর অদ্ভুত চমকপ্রদ বই—'ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড' প্রকাশিত হ'ল। এই শেষোক্ত বইখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মহাপ্রসিদ্ধ হ'য়ে পড়লেন।

ইংলণ্ডের সমস্ত বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁরা সবাই একবাক্যে ষ্টিভেন্সনের চরিত্রের দৃঢ়তা ও নিঃস্বার্থতার কথা স্বীকার ক'রে গেছেন। এই সময় ষ্টিভেন্সনের খ্যাতি এত বেড়ে গেছিল যে, আমেরিকার একজন প্রকাশক তাঁকে বললেন যে, তিনি যদি দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপগুলিতে ভ্রমণ ক'রে তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী লিখে দেন, তবে তিনি ষ্টিভেন্সনকে দুই হাজার পাউণ্ড দেবেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না—তিনি দেখ্‌লেন গরম দেশে ভ্রমণ কর্‌লে তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতি হতে পারে। তাই তিনি সম্মতি দিলেন। তিনি তাঁর পরিবার সহ

কিছুদিনের জন্য দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করতে বেরুলেন। এর ফলে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'ল। এক সময় তাঁর ভ্রমণ শেষ হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু দ্বীপপুঞ্জ ছেড়ে তাঁর মন ইংলণ্ডে ফিরে আসতে চাইল না। তিনি লিখেছেন ঃ "আমার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছিল; আমার অনেক নতুন বন্ধুবান্ধব জুটেছিল; আমার জীবনযাত্রার প্রণালীই গেছিল বদলে; ভ্রমণের দিনগুলো আমার যেন ঠিক পরীর দেশেই কেটেছিল; আমি ওখানেই বাস করব স্থির করলাম। কাজেই দক্ষিণ সমুদ্রের স্যামোয়া দ্বীপে তিনি ছোট-খাটো একটি জমিদারী কিনলেন এবং তার জমিদারীর নাম দিলেন 'ভইলিমা'। এখানে কিছুদিনের জন্য তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল হয়ে গেল এবং তিনি অনেক কিছু লিখে ফেললেন। তিনি দিনে আট ঘণ্টা, ছয় ঘণ্টা ক'রে লিখতেন—তারপর ঘোড়ায় চ'ড়ে অবসর সময়ে নিজের জমিদারী দেখে বেড়াতেন—অনেক সময় নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করতেন। তিনি দেশীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। তাদের নিজের বাড়ীতে এনে খাওয়াতেন আর তাদের সঙ্গে সরস গল্প করতেন। কাজেই স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে খুব ভালবাসত। তারা আদর ক'রে তাঁর নাম দিয়েছিল "টুসিটালা" (Tusitala) অর্থাৎ যে ভাল গল্প বলতে পারে। তিন বছর ধরে এই সুন্দর দ্বীপে তিনি আরামে কাটালেন। বোধ হয় এই তিনটি বছরই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করতেন। তার ফলে আবার তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের

প্রথম দিকে তিনি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হলেন—এই অসুখ থেকে তিনি আর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠলেন না।

আবার তিনি বিছানায় বন্দী হ'য়ে রইলেন। এই সময় তিনি 'সেণ্ট আইভস্ (St. Ivos) নামে একখানি গল্পের বই লিখ্‌ছিলেন। অতিরিক্ত দুর্ব্বলতার জন্য লিখ্‌তে না পারায় তিনি মুখে গল্প ব'লে যেতে লাগ্‌লেন—একজন সে গল্প লিখে যেতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর গলার স্বরও বন্ধ হ'য়ে গেল, কিন্তু তবু তাঁর দুর্দ্দমনীয় সাহসী মন পরাজয় স্বীকার করলে না। তিনি তখন মূকবধিরদের হাতের ভাষার সাহায্যে গল্প বলতে সুরু করলেন। যে ক'রেই হ'ক গল্প তাঁকে শেষ ক'রে যেতেই হবে। কিন্তু গল্প শেষ করা তাঁর ভাগ্যে হল না—প্রফুল্লচিত্তে হাস্‌তে হাস্‌তে বীরের মত তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকে বরণ ক'রে নিলেন। জীবনে এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে তিনি যে কীর্ত্তি রেখে গেছেন, সে কীর্ত্তি তাঁকে অমর ক'রে রাখবে। তিনি যা লিখতেন, তার সম্বন্ধে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল না—তবু কখনও তিনি হতাশ হতেন না। নিজের লেখাকে তিনি সর্ব্বদা অতি যত্নের সঙ্গে উন্নততর কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তেন। তাই তাঁর যুগের সব সমালোচকই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর মত উচ্চাঙ্গের সুন্দর রচনা-রীতি খুব কম লোকেরই থাকে। এই রচনা-রীতি তাঁর আজন্মের সাধনার ফল। এই নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠ বীর সাহিত্য-সেবী জগতে সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার ভাজন।

অরলিন্সের মেয়ে

ইউরোপে ফরাসী দেশের কথা তোমরা সকলেই শুনেছ। আজ যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহিলার জীবন-কথা তোমাদের কাছে বল্‌ব, তিনি 'যোয়ান্ অফ্ আর্ক্' (Joan of Arc) নামে পরিচিত। ফরাসী দেশের ইতিহাসে এই মেয়েটির নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। জগতের ইতিহাসে স্বদেশের জন্য এমন স্বার্থত্যাগের উদাহরণ খুবই কম পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর কথা। ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন রাজা ষষ্ঠ হেন্‌রী উপবিষ্ট, আর ফরাসী দেশের রাজা চার্লস্। দুই দেশের মধ্যে চল্‌ছিল প্রবল শত্রুতা। চার্লস্ কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও হেন্‌রীকে এঁটে উঠ্‌তে পার্‌ছিলেন না। হেন্‌রী ধীরে ধীরে ফরাসী দেশের উপর ইংলণ্ডের প্রভুত্ব বিস্তার কর্‌ছিলেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধে ফরাসী দেশের লোকেরা হেরে যাচ্ছিল আর গ্রামের পর গ্রাম ইংরেজেরা দখল ক'রে নিচ্ছিল। ফরাসী জাতির ধন-প্রাণ ইংরাজ-সৈনিকের হাতে হয়ে উঠেছিল বিপন্ন। জাতির সম্মিলিত রোদন-শব্দে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠেছিল। ফরাসী দেশের তখন মহাদুর্দ্দিন, ভগবানের অভিশাপই বুঝি নেমে এসেছিল ফরাসীর বক্ষে। রাজা চার্লস্ পরাজিত হয়ে অর্‌লিন্সে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন আর ইংরেজসৈন্যেরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। এই অরলিন্স্ নামক স্থানেই কয়েক বছর পূর্ব্বে এক সামান্য কৃষকের ঘরে যোয়ান্ অফ্ আর্ক্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ছোট্ট যোয়ান্ ধীরে ধীরে

পিতৃগৃহে বেড়ে উঠ্ছিলেন। ছোট বয়স থেকেই নিজের জাতির পরাধীনতার দুর্দ্দশা তাঁর বুকে শেলের মত বিঁধত।

ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী তখন সুপ্রসন্না—ইংরেজ প্রবল বিক্রমে অরলিন্স আক্রমণ করলে; অরলিন্স্ জয় করতে পারলেই ফরাসী দেশ সম্পূর্ণ জয় করা যায়। চার্লসের সৈন্যেরা ক্রমাগতই হেরে চল্ল—অবশেষে চার্লস্ যুদ্ধজয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে অপমানজনক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য হলেন। ক্রমে ক্রমে ফরাসী দেশের সকলেই ইংরেজের হাতে পরাজয়ের অপমান ভুলে গেল—ভুল্ল না কেবল একটি মেয়ে। তিনি যোয়ান্। যোয়ান্ আর এখন ছোট মেয়ে নেই—তিনি এখন পূর্ণ যৌবনা। কিন্তু তাঁর প্রিয় জন্মভূমি অরলিন্সের পতনের পর থেকে তাঁর মুখে আর হাসিটি পর্য্যন্ত নেই। খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ ছেড়ে তিনি এখন শুধু নির্জ্জনে ঘুরে ঘুরে বেড়ান—মনে তাঁর একমাত্র চিন্তা কি ক'রে তাঁর স্বদেশকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করা যায়। এই তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। অবশেষে একদিন নির্জ্জনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, তিনি যেন ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়েছেন। ভগবান্ যেন তাঁকে ডেকে বল্লেন: "যোয়ান্, ফরাসী দেশকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য আমি তোমাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেছি।" যোয়ান্ মনে প্রাণে সে কথা বিশ্বাস করলেন। বাড়ীতে গিয়ে আত্মীয়স্বজনকে একথা বলাতে, তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। যোয়ান্ কিন্তু দম্লেন না।

তিনি তাঁর দেশবাসীদের সুপ্ত স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার চেষ্টা কর্‌লেন। তাঁর আবেগপূর্ণ জ্বালাময়ী বক্তৃতার ফলে অনেকেই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌তে রাজী হ'ল। এমনি ক'রে যোয়ানের চারদিকে একটা বড় সৈন্যদল গ'ড়ে উঠ্‌ল। ক্রমে যোয়ানের স্বদেশপ্রেমের কথা রাজা চার্ল্‌সের কানে গেল। তিনি যোয়ান্‌কে ডেকে পাঠালেন। হতাশ রাজা যোয়ানের উদ্দীপনাময়ী মূর্ত্তি দেখে এবং তাঁর আবেগময়ী স্বদেশপ্রেমের বক্তৃতা শুনে পুনরায় রাজ্যোদ্ধারের বিষয়ে একটু আশান্বিত হয়ে উঠ্‌লেন। যোয়ানের প্রাণে অনন্ত আশা— স্বদেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতেই হবে। এর ফলে কিছুদিন পরে আবার অরলিন্‌সের প্রান্তে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ হ'ল। ফরাসী দেশের সেনাপতি এবার যোয়ান্ স্বয়ং। অশ্বপৃষ্ঠে যোয়ানের তেজোময়ী মূর্ত্তি জাতীর প্রাণে এনে দিল অনন্ত আশা ও শক্তি। রণদেবীর অঙ্গুলি চালনে প্রতিটি ফরাসীসৈন্য প্রাণপণ ক'রে যুদ্ধ ক'রে চল্‌ল। আর এর ফলে ফরাসীদের এ যুদ্ধে হ'ল জয়। যোয়ানের প্রাণের আশা পূর্ণ হ'ল। রাজা চার্ল্‌স্ সগর্ব্বে ফরাসী দেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। যুদ্ধশেষে যোয়ান্ নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলেন রাজা চার্ল্‌সের কাছে। রাজা কিন্তু তাঁকে যেতে দিতে চাইলেন না।

তারপর ফরাসী দেশের ঘরে ঘরে যখন বিজয়োৎসব— এমনি দিনে যোয়ানেরই একজন স্বদেশবাসী ফন্দি ক'রে ইংরাজদের কাছে যোয়ান্‌কে ধরিয়ে দিলে। ইংরেজরা ত

আর যোয়ান্‌কে ক্ষমা করতে পারে না তারা যোয়ানের বিচার করল। বিচারে যোয়ান্ দোষী সাব্যস্ত হ'লেন; তাঁকে বলা হ'ল যে, তিনি মানুষ নন—ডাইনী। তারপর তাঁকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারা হ'ল। স্বদেশের জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে যোয়ান্ প্রাণত্যাগ কর্‌লেন। যোয়ানের মৃত্যুর পর আজ কত শতাব্দী অতীত হয়ে গেল—ফরাসী দেশের জাতীয় ইতিহাসে যোয়ান্ অফ্ আর্কের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হয়ে আছে এবং চিরকাল থাক্‌বে।

দানবীর কার্নেগী

দানবীর কার্ণেগীর নাম হয়ত শুনেছ। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্য তিনি যে কত টাকা দান ক'রে গেছেন—সে কথা শুনলে তোমরা হয়ত সহজে বিশ্বাস কর্‌তে চাইবে না। জনসাধারণের উপকারের জন্য তাঁর দানের পরিমাণ কত জান? সাত কোটি পাউণ্ড্ অর্থাৎ আমাদের হিসাবে নব্বুই কোটি টাকারও উপরে।

অথচ কার্ণেগী কোন ধনী কিংবা অভিজাত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন নি—অত্যন্ত সাধারণ বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। একশ বছর পূর্ব্বের কথা—স্কট্‌ল্যাণ্ডের এক দারিদ্র্য-পীড়িত গৃহে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর কার্ণেগী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় কোন উৎসব আনন্দ কিছুই হয়নি, কারণ তাঁর মাতাপিতা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। দরিদ্র [illegible] সন্তানের

জন্ম মানেই ভার বৃদ্ধি। তাঁর বাবা সামান্য তাঁতের কাজ ক'রে কোনমতে জীবিকা নির্ব্বাহ করতেন। সেদিন কেউ জানত না যে, এই বালকই একদিন বড় হ'য়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হবেন।

ক্ষুধার জ্বালা যে কাকে বলে ছোট বয়স থেকেই কার্ণেগী তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছিলেন। কত দিন ত তাঁদের উপবাস ক'রেই কাটাতে হ'ত। অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় তাঁর বাবা নিজের তাঁতখানা পর্য্যন্ত বিক্রী করতে বাধ্য হলেন। জীবিকা নির্ব্বাহের কোন উপায় না থাকাতে কার্ণেগীরা স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে অন্য কোথাও যেয়ে বাস করা স্থির করলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁরা আমেরিকার পিট্স্বার্গের নিকটে যেয়ে বসবাস করতে লাগলেন। কার্ণেগীর বয়স তখন মাত্র ১৩ বৎসর। এই বয়সেই তিনি প্রথমে এক কারখানায় সপ্তাহে পাঁচ শিলিং বেতনে নিযুক্ত হলেন। এর কিছু পরেই তিনি আরেকটি কারখানার কাজে ভর্ত্তি হলেন—বেতন হ'ল সপ্তাহে দুই ডলার। তাঁর কাজ ছিল বয়লারে আগুন দেওয়া এবং ছোট একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন্ চালিত করা। এখানে কিছুদিন থাকার পর তিনি এক টেলিগ্রাফ আফিসে সামান্য সংবাদ-বাহকের কাজে নিযুক্ত হলেন। রাত্রিবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি পিটাস্বার্গে যে-সব লোক বাস করতো তাদের কথা চিন্তা করতেন—মনে মনে তাদের প্রত্যেকেরই মুখের চেহারা ভাবতেন, যাতে পথে দেখা হ'লে তিনি সহজেই তাদের সংবাদ বিলি করতে পারেন। দিনের বেলা তাঁর কাজ শেষ হ'য়ে

গেলে, তিনি তার-বাবুটির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার-যন্ত্রে সংবাদ আদান-প্রদান অভ্যাস করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তারযোগে সংবাদ আদান-প্রদান শিখে ফেল্‌লেন। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে শীঘ্রই তাঁকে তার-বাবুর পদে উন্নীত করলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পেন্‌সিল্‌ভিয়ান্ রেল রোডে তিনি তার-বাবু হিসাবে যোগ দিলেন।

এই পেন্‌সিল্‌ভিয়ান্ রেল রোডে কাজ করার সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে—একদিন রেল রোডের পরিদর্শক অনুপস্থিত ছিলেন—সেই সময় জনমজুরদের মধ্যে এক গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। কার্ণেগী কিন্তু শ্রমিকদের জান্‌তে দিলেন না যে পরি-দর্শক অনুপস্থিত—তিনি পরিদর্শকের নামে নিজে আদেশ জারী করে সব গণ্ডগোল থামিয়ে দিলেন। গণ্ডগোল ত থেমে গেল কিন্তু কার্ণেগীর মনে ভয় হ'ল যে, এই অন্যায় কাজের জন্য বোধ হয় তাঁর চাকরীটি যাবে। কিন্তু সে-রকম কিছুই হ'ল না—কর্ত্তৃপক্ষ তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে পেন্‌সিল্‌ভিয়ান্ রেল রোডের পরিদর্শকপদে নিযুক্ত কর্‌লেন। এমনি ক'রে উত্তরোত্তর তাঁর উন্নতি হয়েই চল্‌ল।

একবার কার্ণেগী এক ট্রেণে ভ্রমণ কর্‌ছিলেন—সেই সময় গাড়ীতে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হ'ল। ভদ্রলোকটি কার্ণেগীকে তাঁর নিজের একটি নূতন আবিষ্কারের কাহিনী বল্‌লেন। কার্ণেগী যদি সে-বিষয়ে তাঁর সহযোগিতা করেন তবে তিনি তাঁকে লভ্যাংশের এক-অষ্টমাংশ দেবেন এ-কথাও বল্‌লেন। কার্ণেগী সহজেই রাজী [illegible]লন এবং এর

ফলে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে কার্ণেগীর বার্ষিক আয় হ'ল এক হাজার পাউণ্ড। এই সময় থেকে কার্ণেগী তাঁর টাকা ব্যবসায়ে খাটাতে সুরু কর্‌লেন এবং ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন থাকায় তাঁর লাভও হ'তে লাগ্‌ল যথেষ্ট। তাঁর যখন সাতাশ বৎসর বয়স তখন তাঁর বার্ষিক আয় দাঁড়াল দশ হাজার পাউণ্ড্। ত্রিশ বছর বয়সে কার্ণেগী রেল রোডের কাজ ছেড়ে দিলেন। ভবিষ্যতে কি কর্‌বেন তাই তিনি ভাবতে লাগ্‌লেন।

তিনি রেলপথ এবং রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণের কারখানা খুল্‌লেন এবং শীঘ্রই অন্যান্য আরও অনেক কোম্পানী খুল্‌লেন। তার ফলে কার্ণেগীর আয় অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। এই সময় তিনি ইস্পাতের ব্যবসায়ের দিকে মনোনিবেশ কর্‌লেন। ইস্পাত যে শীঘ্রই সভ্যজগতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ব'লে গণ্য হবে—দিব্যদৃষ্টিতে কার্ণেগী তা যেন দেখতে পেলেন। তিনি যখন ইস্পাতের ব্যবসায় সুরু কর্‌লেন তখন এ ব্যবসা খুব বেশী আশাপ্রদ ব'লে মনে হ'ল না। কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য—কার্ণেগী-ইস্পাতের জয় হ'ল। আমেরিকার ইস্পাতের যন্ত্রাদির চাহিদা বাজারে অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কার্ণেগীও কোটিপতি হয়ে দাঁড়ালেন। কার্ণেগীর মা এবং ভাই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কার্ণেগী মিস্ লুইস্ হোয়াইটফিল্ডকে বিবাহ করেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হয়েছিল।

কার্ণে গী যখন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ধনী, তখন তিনি একখানি পুস্তিকা প্রচার ক'রে জগৎকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছিলেন। এই পুস্তিকায় তিনি প্রচার করলেন যে, ধনী অবস্থায় মারা যাওয়া পাপ। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কর্ণো গী ব্যবসায় পরিত্যাগ কর্‌লেন এবং সৎকার্য্যের জন্য ধন দান সুরু কর্‌লেন। যে পরিমাণ টাকা তিনি দান কর্‌লেন তাতে জগৎ স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। যখন তিনি ব্যবসায় ত্যাগ কর্‌লেন তখন তাঁর কোম্পানী কত টাকায় বিক্রী হ'ল জানো? দাম হ'ল আট কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় একশ কোটি টাকা। তার মধ্যে ৯০ কোটি টাকার উপর তিনি দান করে গেলেন সর্ব্বসাধারণের জন্য। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশই কার্ণে গীর এই দান থেকে উপকৃত হয়েছে।

তিনি নিজ জীবনে শিক্ষার সুযোগ পাননি—তাই শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক টাকা দান করলেন। তিনি ২৮১১টি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ক'রে দিয়েছিলেন। তারপর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে জগতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি দুই কোটি পাউণ্ডের একটি ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে এই মহামানব শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর্‌লেন। কার্ণে গীর জীবনে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। নীচে কার্ণে গীর জীবনের কয়েকটি মূলমন্ত্র উদ্ধৃত ক'রে দিলাম:—(১) জীবন উপভোগ কর—কর্ম্মের ক্রীতদাস হয়ো না। (২) কোটিপতি না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বরকম অসংযম ত্যাগ করো। (৩) দায়িত্ব নিতে ভয় ক'রো না। (৪) ধনী অবস্থায় মৃত্যু হওয়া কলঙ্ক। (৫) পরিশ্রমী

হও, আয় বুঝে ব্যয় ক'রো। (৬) যা কিছু উপার্জ্জন করেছ দান করো; ধনের বশ্যতা স্বীকার ক'রো না। (৭) যে লোক সর্ব্বদা কাজ করে সে-ই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়, এটা ভুল ধারণা। (৮) প্রত্যেক যুবকের ভাগ্যেই একবার সুযোগ আসে—সুযোগের সদ্ব্যবহার করাটাই বড় কথা।

সত্যিকারের ক্রুশো

রবিন্‌সন্ ক্রুশোর রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক অভিযান-কাহিনীর সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যাঁর কথা বল্‌ব তাঁরও জীবন রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মতই দুঃসাহসিক সমুদ্রাভিযানে পূর্ণ। এঁর নাম ম্যাথু ফ্লিণ্ডার্স (Matheu Flinders)। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এঁর জন্ম হয়। ছোট্ট বয়েস থেকে ম্যাথু দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার বই পড়্‌তে ভালবাস্‌তেন। দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রায় পূর্ণ জীবনই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। ম্যাথু কেবলমাত্র সমুদ্রের স্বপ্ন দেখেই অলসভাবে দিন কাটাতেন না—তিনি নিজেকে সমুদ্র-যাত্রার উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তুল্‌ছিলেন ধীরে ধীরে। অঙ্ক তিনি ভালই জান্‌তেন। তাঁর যখন মাত্র ১৩ বৎসর বয়স তখনই তাঁর সমুদ্রযাত্রা এবং নৌ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু বই পড়া হয়ে গেছে। তাঁর পিতা, পিতামহ প্রভৃতি সবাই ছিলেন ডাক্তার। আত্মীয় স্বজন সকলেরই আশা ছিল যে ম্যাথুও ডাক্তার হবে। কিন্তু তাঁর পিতা লক্ষ্য ক'রে দেখলেন যে

পুত্রের মতিগতি অন্য রকমের। যখন তিনি বুঝতে পার্‌লেন যে পুত্রের সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছা কেবল তরুণ মনের অলস স্বপ্ন-বিলাস নয়—এর মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা আছে, তখন তিনি আর পুত্রের সমুদ্রযাত্রায় আপত্তি কর্‌লেন না। ম্যাথুর বয়েস যখন মাত্র ১৫ বৎসর তখনই তিনি সৌভাগ্যক্রমে একটি জাহাজে কাজ পেয়ে হৃষ্টচিত্তে কাজটি গ্রহণ কর্‌লেন।

মাত্র নয় মাসের মধ্যেই ম্যাথুর পদোন্নোতি হ'ল। কর্ম্মঠতার গুণে তিনি 'বেলেরোফোন্' (Bellerophone) জাহাজে বদ্‌লি হলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই জাহাজটি খুব প্রসিদ্ধ, কারণ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান্ বন্দী হ'য়ে এই জাহাজেই ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ছোট্ট ম্যাথু খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ কর্‌তে লাগলেন এবং নিত্য-নতুন জ্ঞানার্জ্জনে প্রবৃত্ত হলেন। প্রায় এক বছর পরে তিনি কর্ম্ম-দক্ষতার গুণে 'প্রভিডেন্স' জাহাজে বদ্‌লি হন। পরে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে 'রিলায়্যান্স্' জাহাজে বদ্‌লি হ'য়ে ম্যাথু দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে যাত্রা কর্‌লেন। এ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ার বেশীর ভাগ স্থানই ছিল অনাবিষ্কৃত। অজানা দেশে নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনায় ম্যাথুর প্রাণ নেচে উঠ্‌ল।

ওই জাহাজে জর্জ্জ ব্যাস্ (George Bass) নামে এক ডাক্তারের সঙ্গে ম্যাথুর গভীর বন্ধুত্ব হ'য়ে গেল। দুইজনেরই সমুদ্রযাত্রা এবং নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশা ছিল খুব প্রবল—তাই দুইজনের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি ভাব হ'য়ে গেল।

'রিলায়্যান্স' জাহাজ সীড্‌নীতে নোঙর ফেলামাত্রই দুই বন্ধু কাপ্তেনের হুকুম নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আবিষ্কারের নেশায়। তাঁরা স্থির কর্‌লেন যে সিড্‌নীর দক্ষিণ উপকূলই হবে তাঁদের প্রথম আবিষ্কারের স্থান। এই দক্ষিণ উপকূলে অন্য কোন আবিষ্কারক পদার্পণ করেন নি। এই দুঃসাহসী যুবকদ্বয় আট ফিট লম্বা ছোট একটি নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লেন। এই ভঙ্গুর ক্ষুদ্র নৌকাটি নিয়ে দুই বন্ধু প্রশান্ত মহাসাগরের পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউয়ের সম্মুখীন হলেন। প্রাণে একটুও ভয় নেই। সিড্‌নী বন্দর ত্যাগ করার কিছু পরেই এল প্রবল ঝড়—সমুদ্রের সেই প্রবল ঝড়েব বিরুদ্ধে লড়ে তীরে নৌকা ভিড়ানো সম্ভব হ'ল না—নৌকাতেই তাঁদের সে দুর্য্যোগময় রাত্রি কাট্‌ল! কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! ঢেউয়ের জলে তাঁদের নৌকার বারুদগুলো গেল সব ভিজে—বন্দুক ছোঁড়ার উপায় নেই। তীরে গেলে অসভ্য অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা যদি তাঁদের আক্রমণ করে তবে তাঁরা আত্মরক্ষা করবেন কি ক'রে—এই চিন্তা তাঁদের ব্যাকুল ক'রে তুলল। অথচ তীরে না গেলেও উপায় নেই! তাঁদের পানীয় জল গেছল সব ফুরিয়ে—সমুদ্রের নোনা জল ত খাওয়া চলে না। বহু ভেবে চিন্তে তাঁরা জলের সন্ধানে তীরেই নামলেন। তীরে নেমেই দুজন অষ্ট্রেলিয়াবাসীর সঙ্গে তাঁদের দেখা—তারা তাঁদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার কর্‌ল—পানীয় জল যেখানে পাওয়া যায়—সে জায়গা দেখিয়ে দিতেও স্বীকার করল। ম্যাথু আর তাঁর বন্ধু লোক দু'টির সঙ্গে এগিয়ে চল্‌লেন।

এই আদিম অসভ্য অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা মাথার চুল কাট্‌তে জান্‌তো না। দীর্ঘ চুলে তাদের মাথা এবং মুখমণ্ডল ঢাকা থাকত। ম্যাথু এবং তাঁর বন্ধু ইঙ্গিতে ওদের বুঝিয়ে দিলেন যে তাদের মাথার চুল কাটা উচিত। ওরা প্রস্তাবটি সমর্থন করলে। ম্যাথু লম্বা কাঁচি দিয়ে ওদের মাথার চুল কাটতে আরম্ভ কর্‌লেন—প্রথমটা কাঁচি দেখে ওরা ভয় পেয়েছিল তবে চুল কাটা শেষ হ'লে কাঁচির গুণ দেখে ওরা খুসীই হ'ল। এই চুলকাটা ব্যাপার ম্যাথু এবং তাঁর বন্ধুর খুব উপকারে এসেছিল। যখন তাঁরা একটি পানীয় জলের ঝরণার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন দেখলেন যে সেখানে অনেকগুলি অসভ্য লোক দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তাঁদের প্রাণ শুকিয়ে উঠ্‌ল। তাঁদের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা শ্বেতাঙ্গ দুজনকে মোটেই ভাল চক্ষে দেখ্‌ছিল না। যাক্‌, অসভ্য লোকেরা সে যাত্রা শ্বেতাঙ্গ দুজনের কোন অনিষ্ট কর্‌ল না। কারণ শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে ওদের নিজের স্বজাতি দুজন ছিল। তার উপর ওদের স্বজাতীয় লোকদুটির চুল সুন্দরভাবে কাটা দেখে ওদেরও চুল কাটবার সখ হ'ল। এক একজন এগিয়ে এসে মাথা নামিয়ে দেয় ম্যাথুর কাঁচির সামনে। ম্যাথুকে নাপিত সেজে বসতে হ'ল। ইত্যবসরে 'ব্যাস্' জল নিয়ে গেলেন নৌকায়, আর বারুদগুলোও দিলেন রৌদ্রে নেড়ে। পরদিন নৌকায় চড়ে আবার সিডনীর উদ্দেশে দিলেন পাড়ি। বহু কষ্টে ঝড়ঝঞ্ঝা এবং সামুদ্রিক পর্ব্বতের হাত এড়িয়ে দুদিন পরে তাঁরা 'রিলায়্যান্স' জাহাজে ফিরে এলেন।

এরপর কিছুদিন ম্যাথ্ আর আবিষ্কারের অভিযানে বেরুতে পারলেন না। কারণ তিনি এখন জাহাজের লেফ্‌টেনাণ্ট পদে উন্নীত হয়েছিলেন। জাহাজের পর্য্যবেক্ষণ নিয়েই তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকতেন। ব্যাস্ আর কি করেন—একা একা কিছুদিন ঘুরে বেড়ালেন। পরে দুইবন্ধু আবার 'নরফোক্' নামক ক্ষুদ্র একটি আধভাঙ্গা জাহাজে ক'রে বেরুলেন ফারনো দ্বীপাবলীর উদ্দেশে। ফারনোতে তাঁরা 'তামার' নামে একটি অনাবিষ্কৃত নদীর মোহানা আবিষ্কার করলেন। তারপর তাঁরা ট্যাসম্যানিয়া (Tasmania) উপকূলে উপসাগরের মত একটা স্থানে এসে পড়লেন। এঁরা এখানে আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এটাকে উপসাগর বলেই লোকে জানত। কিন্তু এরা আবিষ্কার করলেন যে এটা উপসাগর নয়, একটা প্রণালী মাত্র। পরে এইটি ম্যাথুর বন্ধুর নামানুসারে"ব্যাস্ প্রণালী" নামে অভিহিত হয়েছিল।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে অর্দ্ধভগ্ন একখানা জাহাজে ক'রে তিনি আবার সমুদ্রে পাড়ি দিলেন। এই সময় কাপ্তেন কুক্ কেবলমাত্র অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্বাংশ আবিষ্কার ক'রে ইংরেজের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ তখনও অনাবিষ্কৃত। এর মধ্যে গুজব রটেছিল যে ফরাসীরা নাকি সেই সব অংশে অভিযান ক'রে ফরাসী প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টায় আছে। কাজেই ম্যাথু তাড়াতাড়ি ক'রে অষ্ট্রেলিয়ার অনাবিষ্কৃত অংশ আবিষ্কারের আশায় বেরিয়ে পড়লেন।

ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ম্যাথু অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উপস্থিত হলেন। তিনি নিম্নোক্ত স্থানগুলি আবিষ্কার কর্‌লেন এবং এগুলির নামকরণও কর্‌লেন ঃ স্পেন্‌সার উপসাগর, ক্যাঙ্গারু দ্বীপ, সেণ্টভিন্‌সেণ্ট উপসাগর প্রভৃতি। বহুকাল ধ'রে বহু দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রে অষ্ট্রেলিয়ার অনেক নূতন জায়গা ম্যাথ্‌ ফ্লিণ্ডার্স আবিষ্কার কর্‌লেন।

দীর্ঘকাল পরে 'কাম্বার্‌ল্যাণ্ড্‌' (Cumberland) জাহাজে চ'ড়ে ম্যাথু ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হলেন। কাম্বার্‌ল্যাণ্ড্‌ জাহাজটা ছিল পুরানো—ভারত মহাসাগরের প্রবল ঝড়ে জাহাজটি বড় বিপন্ন হ'য়ে পড়্‌ল। বহুকষ্টে এই অর্দ্ধভগ্ন জাহাজখানি নিয়ে ফরাসীদের অধীনস্থ মরিশাস্‌ (Mauritius) দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেন। ইংরেজ আর ফরাসীতে তখন চলছিল যুদ্ধ। ম্যাথু মরিশাসে নামামাত্র সেখানকার ফরাসী শাসনকর্ত্তা একটা বাজে অজুহাতে তাঁকে বন্দী কর্‌লেন। প্রথমে তাঁকে কারাগারে রাখা হ'ল—পরে মুক্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত ম্যাথ্‌ অসদুপায়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা করবেন না—এই প্রতিশ্রুতিতে মরিশাস্‌ দ্বীপে তাঁহাকে স্বাধীনভাবে চলাফেরা কর্‌তে দেওয়া হয়েছিল। কোথায় ম্যাথু দেশে ফির্‌বেন, তা না হ'য়ে নির্ব্বান্ধব বিদেশী দ্বীপে তিনি শত্রুর নজরবন্দী হ'য়ে রইলেন! একেই বলে ভাগ্য। তিনি কিন্তু এই সময়টা বৃথাই যাপন কর্‌লেন না। তাঁর আবিষ্কারের চমকপ্রদ কাহিনীপূর্ণ একখানি বই লিখতে লাগলেন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট তাঁর কথা ভুলে যান নি—

নানা উপায়ে তাঁর মুক্তির জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন জানান হ'ল। নেপোলিয়ান্-শাসিত ফরাসী দেশ তখন নিজের ঘর সাম্‌লাতে এত ব্যস্ত ছিল যে কোথায় কোন সুদূর দ্বীপে একজন সামান্য ইংরেজ আবিষ্কারক বন্দী হ'য়ে আছে, সে খোঁজ নেবার তাদের সময় ছিল না। অবশেষে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ান্ যখন কায়েমীভাবে ফরাসী দেশের উপর আপন প্রভুত্ব বিস্তার করলেন, তখন তিনি ম্যাথুর মুক্তি পত্র স্বাক্ষর করলেন। মুক্তির আদেশ মরিশাস্ দ্বীপে পৌঁছুতেও হ'য়ে গেল দেরী। ইংরেজ তখন সমুদ্রের একচ্ছত্র সম্রাট। ইংরেজের হাত এড়িয়ে ফরাসী জাহাজের পক্ষে মরিশাসে পৌছানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নেপোলিয়ান্-স্বাক্ষরিত চারখানি মুক্তিপত্র ভিন্ন ভিন্ন চারখানা ফরাসী জাহাজে ক'রে মরিশাসে পাঠানো হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই মুক্তি-পত্রের একখানাও মরিশাস্ দ্বীপে পৌছল না তার কারণ পথিমধ্যে প্রত্যেকখানা ফরাসী জাহাজই ইংরেজদের হাতে প'ড়ে লুণ্ঠিত হয়েছিল। অবশেষে এই মুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ষোলমাস পরে একখানা ইংরেজ জাহাজই এই মুক্তিপত্র মরিশাস্ দ্বীপে পৌছে দেয়। পথিমধ্যে ইংরেজ-লুণ্ঠিত একখানি ফরাসী জাহাজ থেকে এই মুক্তিপত্র ইংরেজদের হস্তগত হয়েছিল।

ম্যাথুর প্রাণে আশার সঞ্চার হ'ল—এতদিনে তিনি বুঝি তাঁর প্রিয় স্বদেশের মুখ আবার দেখ্‌তে পাবেন। কিন্তু দৈব অন্যরকম ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। তাঁকে এবারও নিরাশ

হতে হ'ল। ফরাসী শাসনকর্ত্তা ম্যাথুকে মুক্তি দিতে ভয় পেলেন। ম্যাথু তখন মরিশাসের নাড়ীনক্ষত্রের সব খবর জানেন। ইংরেজ আর ফরাসীতে তখনও যুদ্ধ চল্‌ছিল—ম্যাথুর কাছ থেকে খোঁজ খবর সব জেনে নিয়ে ইংরেজেরা যদি মরিশাস্ দখল করে, এই ভয়ে ম্যাথুকে ছাড়্‌তে রাজী হ'লেন না কাজেই আরো সাড়ে তিন বছরের জন্য হতভাগ্য ম্যাথুকে ফরাসীদের হাতে বন্দী থাক্‌তে হ'ল। ইচ্ছা করলে অসাধু উপায়ে মুক্তি তিনি পেতে পার্‌তেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ধর্ম্মভীরু। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর্‌তে তাঁর ছিল সম্পূর্ণ অমত।

অবশেষে একদিন সত্যসত্যই ম্যাথু মুক্তি পেলেন—আনন্দে তাঁর হৃদয় নেচে উঠ্‌ল। ইংলণ্ডের জাহাজে চেপে তিনি দেশে ফিরে এলেন। দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে এই দুঃসাহসিক অভিযানকারী খুবই প্রশংসা পেলেন।

বিদেশী দ্বীপে বহুদিন থাকার ফলে এবং আবিষ্কারজনিত অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনাহারের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। এর ফলে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে এই দুঃসাহসিক অভিযানকারীর অকালমৃত্যু হয়। তিনি বেশীদিন বেঁচে ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁর অল্পপরিসর জীবনে তিনি যে কাজ ক'রে গেছেন, তার ফলে জগতে তিনি অমর কীর্ত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ

বর্ত্তমান ভারতে প্রসিদ্ধি হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর পরেই রবীন্দ্রনাথের নাম কর্‌তে হয়। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানকার শিক্ষিত লোকেরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েননি বা তাঁর নাম জানেন না। বহু দেশের বহু ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ হয়েছে এবং সর্ব্বত্র তাঁর কবিতা সমান আদর পেয়েছে। এই বিশ্ব-জনীনতাই রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষত্ব। আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার সন্তান। তাঁরই বহুমুখী প্রতিভার গুণে বাংলাসাহিত্য আজ জগৎসভায় বিশিষ্ট আসন দাবী কর্‌তে পারে।

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বংশ নানাদিক দিয়ে বাংলার জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই ঠাকুর পরিবার শুধু বংশানুক্রমিক বড় জমিদার তা নয়—তাঁরা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, রাজনীতি এবং ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও চিরপ্রসিদ্ধ। প্রথম অবস্থায় ঠাকুর পরিবারের পদবী ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁরা বোধ হয় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস সুরু করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁরা এই ঠাকুর উপাধি পেয়েছিলেন—এই উপাধিতেই তাঁরা আজ সর্ব্বত্র পরিচিত। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পদমর্য্যাদা প্রভৃতি সব দিক থেকেই ঠাকুর পরিবার শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও এই

বংশে অনেক মহামনীষির জন্ম হয়েছে—তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে এখানে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। রাজা রাম-মোহন রায় যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এই ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায়ই সে ধর্ম্ম উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়েই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার পিছনে ছিল প্রধানতঃ এই দুইজন মহাপুরুষের প্রচেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এই ঠাকুর বংশে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে (বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের শৈশব জীবন খুব সুখের ছিল না। খুব অল্প বয়সেই তিনি মাকে হারিয়ে-ছিলেন। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথের জীবন ছিল অনেকটা প্রাচীন কালের ঋষিদের মত কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ —তিনি বেশীর ভাগ সময় ধর্ম্মালোচনা এবং ভগবৎ আরাধনায়

কাটাতেন। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের শৈশব জীবনের সমস্ত ভার এসে পড়েছিল বাড়ীর বিশ্বাসী চাকরবাকরদের উপর, এদের সঙ্গেই তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাট্‌ত। তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে তিনি বাল্যের ঘটনাগুলি সুন্দরভাবে লিখে রেখেছেন।

প্রায় প্রত্যেক বড় কবি এবং সাহিত্যিকের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায় যে তাঁরা ছোটবেলা থেকেই একটু বিপ্লবী এবং খামখেয়ালী হন—বিদ্যালয়ের রুটিন্ মাফিক পড়াশুনোর প্রতি তাঁদের বিশেষ আগ্রহ থাকে না। রবীন্দ্রনাথও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন; প্রথম থেকেই তিনি বিদ্যালয়কে ঘৃণার চোখে দেখ্‌তে সুরু করেছিলেন। তাঁকে প্রথমে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি ও পরে সেণ্ট্ জেভিয়ার্সে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হ'ল কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা কিছুতেই কম্‌ল না। অবশেষে তাঁর অভিভাবকেরা তাঁকে বাড়ীতে পড়্‌বার অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন—রবীন্দ্রনাথও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বিদ্যালয়ে না গেলেও তাঁর পড়াশুনোর বিরাম ছিল না—জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা তাঁর প্রবল ছিল। এই আদর্শবাদী স্বপ্নালস ছেলেটির প্রকৃতি আত্মীয়স্বজন কেউ বড় বেশী বুঝতে পার্‌তেন না।

তাঁর বাবা অনবরত ভ্রমণ ক'রে বেড়াতেন—মাঝে মাঝেই রবীন্দ্রনাথ পিতার ভ্রমণসঙ্গী হতেন। ছেলেবেলায় তাঁর কিছুদিন কেটেছিল কলিকাতার আশে পাশে গ্রামগুলিতে—সেই সময় প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল। প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের যোগ বড় ঘনিষ্ঠ—প্রকৃতিদেবী তাঁর কাব্যে একটা বিশিষ্ট অংশ দখল ক'রে আছেন। ১৮৭৮

খৃষ্টাব্দে মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি প্রথমবার বিলাতে যান। ইংলণ্ডে তিনি কিছুদিন ব্রাইটনের একটা স্কুলে পড়েছিলেন— পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজেও যোগ দিয়েছিলেন। প্রায় এক বৎসর বিলাতে কাটানোর পর তিনি দেশে ফিরে এলেন। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে আমাদের বলেছেন যে তাঁর বিলাতের দিনগুলো বড় নিঃসঙ্গভাবে কেটেছিল—সর্ব্বদা তিনি নিজেকে সঙ্গীহীন মনে কর্‌তেন।

এই সব ভ্রমণে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি বাধা পাচ্ছিল না মোটেই। তিনি পূর্ণোদ্যমে সাহিত্যচর্চ্চা করছিলেন। তিনি যখন হাঁটতে সুরু করেছিলেন তখন থেকেই তিনি কবিতা লিখ্‌তে সুরু করেছিলেন বলা চলে। তিনি জন্ম-কবি। মাত্র নয় বৎসর বয়সে তিনি একটি চমৎকার ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। পনের বছর বয়স হব্বার আগেই ছাপার অক্ষরে তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তিনি যখন আঠারো বছরে পা দিয়েছিলেন তখন তাঁর বহু কবিতা এবং অনেক গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় তিনি সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতী' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই 'ভারতী' পত্রিকায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর কতকগুলি বৈষ্ণবপদাবলী বেরিয়েছিল ভানুসিংহের কাল্পনিক নামে। এই পদাবলী নিয়ে তখন পাঠকসমাজে রীতিমত হৈ চৈ প'ড়ে গেছিল। ভাব ও ভাষার দিক থেকে এই পদাবলীগুলির সঙ্গে মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতার এত আশ্চর্য্য মিল ছিল যে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও মনে করেছিলেন যে এগুলো ভানুসিংহ নামক কোন প্রাচীন বৈষ্ণব

কবির লেখা। এই প্রথম যুগের কবিতাগুলোর মধ্যে অনেক দোষ আছে এবং আজকের দিনে অবশ্য তাদের আর কোন বিশেষ মূল্য নেই—তবু রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার ক্রমবিকাশে এদের দান কম নয়। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কিরূপ অজস্র লিখ্‌তেন তা সেই সময়ের 'ভারতী' পত্রিকা দেখলেই বোঝা যায়। এই পত্রিকাখানির প্রতিসংখ্যায় তাঁর অনেক লেখা থাক্‌ত। এর পরেই রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' 'প্রভাত-সঙ্গীত' নামক কবিতার বই দুখানি বেরোয়। তাঁর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামক নাটকও এই সময়ের লেখা। এই যুগের আর দুখানি উল্লেখযোগ্য কবিতার বইয়ের নাম 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৭ খৃঃ)। 'ছবি ও গান' বইটির 'রাহুর প্রেম' কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই সময় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্তা মৃণালিনী দেবীকে বিবাহ করেন। 'বন্দেমাতরমের' ঋষি উপন্যাস-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও এই সময় রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা সুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ যে কালে একজন বিশ্ব-প্রসিদ্ধ কবি হবেন বঙ্কিমচন্দ্র তা বুঝতে পেরেছিলেন—তাই এক সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব সেরে বেরুনোর সময় তিনি নিজের গলার ফুলের মালা কিশোর রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন। তাঁর সে আশীর্ব্বাণী সফল হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি সভায় নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি গাজীপুরে যান—গাজীপুর গোলাপের

দেশ। এইখানেই কবির 'মানসী' নামক কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। তাঁর আরও ভ্রমণ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পিতা আদেশ করলেন যে জমিদারী পরিদর্শন্ করতে তাঁকে গঙ্গাতীরে শিলাইদহে যেতে হবে। শিলাইদহে তাঁর জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বৎসর কেটেছিল। কবিতা লেখা ছাড়া জমিদারী কার্য্যেও যে তিনি সুনিপুণ তা তিনি প্রমাণ কর্‌লেন। এই সময় তিনি প্রজাসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেছিলেন ফলে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল বহুল পরিমাণে। এইখানেই কবি তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধন করেছিলেন। এখানে তাঁর মনের শান্তি এবং অবসর ছিল প্রচুর। এই সময় 'সাধনা' পত্রিকায় চার বছর ধরে অবিরাম বহু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখেছিলেন—শুধু তাই নয়, শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবেও তিনি সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'বিসর্জ্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা' এই সময়ের লেখা। 'সোণার তরী' এবং 'চিত্রা' নামক কাব্য গ্রন্থদ্বয়ও এই সময়ে রচিত হয়েছিল। 'চিত্রার' উর্ব্বশী কবিতাটি বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লিরিক্ কবিতা। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে 'সাধনা' পত্রিকাখানির প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে গেল—সেই সঙ্গে সৌন্দর্য্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথেরও সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হ'ল। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরে ছিলেন—তিনি ছিলেন শুধু নিছক সৌন্দর্য্যের উপাসক। এখন বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে আসার জন্য তিনি ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন। বাংলার জাতীয় জীবনেও সেই সময় তুমুল সাড়া জেগেছিল—

রবীন্দ্রনাথ দেশমাতৃকার আহ্বান শুন্‌তে পেলেন। তিনি তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে ঘুমন্ত জাতিকে জাগানোর চেষ্টা কর্‌লেন—এদেশের গৌরবময় অতীতের ছবি দেশবাসীর চোখের সামনে তুলে ধর্‌লেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য রচনা 'ক্ষণিকা' এবং 'কথা ও কাহিনী'। কিন্তু তাঁর এই সময়ের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা। শান্তিনিকেতন বোলপুর ষ্টেশনের কাছেই—তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এখানে প্রকৃতির কোলে শান্তি লাভের আসায় বেড়াতে আসতেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই শান্তিনিকেতন কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। অতি ক্ষুদ্রভাবে এই বিদ্যায়তনটির কাজ সুরু হয়েছিল কিন্তু বর্ত্তমানে এই বিশ্ব-ভারতী বিদ্যালয় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কবিগুরু তাঁর সমস্ত শক্তি এবং অর্থ এর পিছনে অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে তিনি তাঁর প্রিয় এই বিদ্যায়তনটিকে গ'ড়ে তুলেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার অপূর্ব্ব সম্মিলন ঘটেছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যাকেন্দ্রে। আদর্শবাদী বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্র-নাথের জীবনের একটি আদর্শ অন্ততঃ এই শান্তিনিকেতনের মধ্য দিয়ে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছে। নানাদেশের, নানা-ভাষার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা এখানে উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা বিধান করেন—সর্ব্বোপরি বৃদ্ধ কবি নিজেও তাদের মাঝে মাঝে শিক্ষাদান ক'রে থাকেন। এ ছাড়া এখানে

সঙ্গীত শিল্পকলা প্রভৃতি সুকুমার শিল্পেরও চর্চ্চা হ'য়ে থাকে।

এর পরের কয় বৎসর রবীন্দ্রনাথ পরপর কয়েকটি শোক পান। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কবির পত্নী-বিয়োগ হয়—তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা ক্ষয়রোগে ভুগ্‌ছিলেন—১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দেহত্যাগ করলেন—এর দুবৎসর পরে তাঁর প্রথম পুত্রটির মৃত্যু হয়। এই সময়টা রবীন্দ্রনাথের জীবনে চরম দুঃসময়। এই সময়ে রচিত কাব্যগ্রন্থ 'খেয়া' এবং 'স্মরণে'র মধ্যে আমরা কবির এই ব্যক্তিগত শোকের ছায়া দেখতে পাই। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'গোরা'ও এই সময়ে লেখা।

এই সময়ে বঙ্গভঙ্গ নিয়ে তুমুল আন্দোলন চল্‌ছিল—রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিলেন। তিনি স্বদেশী বিদ্যালয় ও অনেক গ্রাম্য সমিতি স্থাপন কর্‌লেন এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে দেশের কাজে লেগে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক বহু প্রসিদ্ধ গান এই সময়ের লেখা। কিন্তু তাঁর কবি-চিত্ত বেশীদিন পঙ্কিল রাজনীতির সঙ্কীর্ণতা সহ্য কর্‌তে পারল না—তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। তিনি রাজনীতি ত্যাগ ক'রে শান্তির স্বর্গ শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। রাজনীতি ত্যাগ করায় অনেকেই তাঁর নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলেন কিন্তু তিনি কারও কথায় কাণ দিলেন না। রাজনীতি এবং সামাজিক সমস্যার চেয়ে ধর্ম্মভাব এখন তাঁর কাছে বড় হ'য়ে দেখা দিল। এই সময় তিনি 'ডাকঘর', 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি লিখেছিলেন। 'গীতাঞ্জলি' তাঁর প্রথম ধর্ম্মমূলক

কবিতার বই নয়। এর আগে 'নৈবেদ্য' বেরিয়েছিল কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তেই আমরা রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গেলেন—সেখানে তাঁর বন্ধু আইরিস্ কবি ইয়েট্স্এর প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হ'ল—অনেক মনীষী তাঁর কবিতাগুলি প'ড়ে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা কর্‌লেন। তারপর আমেরিকা ঘুরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শীতকালে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। তাঁর প্রত্যাগমনের কয়েক সপ্তাহ পরেই খবর এল যে তিনি সাহিত্যের জন্য বিশ্বপ্রসিদ্ধ 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন। অমনই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রসিদ্ধ হ'য়ে পড়্‌লেন। এর পরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব্ লিটারেচার্' উপাধিতে ভূষিত কর্‌লেন—১৯১৪খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁকে 'স্যার' উপাধি দিলেন। পরে ১৯১৯খৃষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তিনি এই স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি লিট্' উপাধি দিয়েছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি ডি লিট্ উপাধি পেয়েছেন। নোবেল্ প্রাইজ পাবার পর থেকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথ অব্যাহত গতিতে সাহিত্য-সৃষ্টি ক'রেছেন। 'গীতিমাল্য', 'গীতালী', 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া', 'পুনশ্চ' প্রভৃতি অনেক কবিতার বই তিনি তারপরে লিখেছেন। এর মধ্যে 'বলাকা'ই বোধ হয় রবীন্দ্রকাব্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এছাড়া বহু উপন্যাস, গল্প এবং প্রবন্ধের বই

তিনি লিখেছেন। ১৯১৬খৃষ্টাব্দে তিনি 'জাতীয়তা' সম্বন্ধে জাপানে এবং 'ব্যক্তিত্ব' সম্বন্ধে আমেরিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই সমস্ত কাজের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনের কথা কিন্তু ভোলেন নি—তিনি নীরবে তাঁর প্রিয় এই বিদ্যানিকেতনটির উন্নতি বিধান ক'রে চলেছিলেন।

ইতিমধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বিদেশে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল—নানা স্থান থেকে তিনি নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন বক্তৃতা করবার জন্য। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁকে প্রায় বার সাতেক ইউরোপে, আমেরিকায় এবং সুদূর প্রাচ্যে বক্তৃতা দিতে যেতে হয়েছিল। প্রত্যেক স্থানেই তিনি বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। তিনি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে 'মানব-ধর্ম্ম' সম্বন্ধে 'হিবার্ট বক্তৃতা' (Hibbert Lectures) দিয়েছিলেন। তিনি সত্তর বছরে পদার্পণ করলে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে আইনষ্টাইন্, হেন্‌রিক্ ম্যান্, বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্, প্রভৃতি মহামনীষীদের রচনা দিয়ে তাঁর সম্মানার্থ একখানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে তাঁর দেশবাসীরাও রবীন্দ্র-জয়ন্তী ক'রে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন।

একটি ছোট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা আলোচনা করা চলে না। তিনি বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি—পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে এত বড় প্রতিভা খুব কমই দেখা যায়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্যের

শ্রেষ্ঠ ভাবধারা এসে রবীন্দ্রনাথে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল —তিনি বড় প্রতিভা ব'লেই বিশ্বের ভাবকে নিজের ক'রে নিতে পেরেছিলেন। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ওপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র দানে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে এসেছেন। কবিতা ছাড়াও নাটক, উপন্যাস, গান, প্রবন্ধ, গল্প, সমালোচনা, শিশু-সাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্যের সর্ব্ববিভাগেই রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখেন। চিত্রাঙ্কনেও রবীন্দ্রনাথ কম নিপুণ ছিলেন না—তিনি নিজে ভাল গাইতে জানতেন এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর মত জ্ঞান অনেক বড় ওস্তাদেরও ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বাগ্মিতাও অসাধারণ—তাঁর ঋষিকল্প চেহারা নিয়ে সুমিষ্ট গলায় রবীন্দ্রনাথ যখন বক্তৃতা দিতেন তখন শ্রোতারা মুগ্ধ না হ'য়ে পারত না। এমন অলোক-সামান্য বহুমুখী প্রতিভা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে স্বামী বিবেকানন্দ আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। শঙ্করাচার্য্য রামানুজের পরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের এমন পূর্ণ বিকাশ আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে এই দুজনের পরেই স্বামীজীর নাম করতে হয়। মাত্র চল্লিশ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন কিন্তু এই সামান্য কয়েক বৎসরে তিনি ভারতের ধর্ম্মজীবনে এবং সমাজজীবনে যে পরিবর্ত্তন সাধন করেছিলেন, সে-কথা ভাব্‌লেও বিস্মিত হ'তে হয়। এরূপ অদ্ভুত জ্ঞানযোগী এবং কর্ম্মবীর খুব কমই পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের বীর-চরিত্রের বৈদ্যুত-সংস্পর্শে এসে ভারতের জাতীয় জীবনের রূপ বদ্‌লে গেছে—তাই ভারতের ঘরে ঘরে আজও বিবেকানন্দের পুণ্য নাম প্রতিধ্বনিত হয়।

বাংলার জাতীয় জীবনের দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীকে 'স্বর্ণ-যুগ' বলা চলে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-রাজনীতি-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত দিক্ থেকেই উনবিংশ শতাব্দী জাগরণের যুগ। এ-যুগে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যত প্রতিভাশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল আর কোনও যুগে তত হয়নি। বিবেকানন্দেরও জন্ম এই উনবিংশ শতাব্দীতে এবং তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে নিবদ্ধ। কলিকাতা নগরীতে সিমুলিয়া দত্ত-পরিবারে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত—বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম। তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন; তাঁর চরিত্রে যে তাঁর মায়ের প্রভাব যথেষ্ট ছিল একথা তিনি নিজে স্বীকার ক'রে গেছেন। শৈশব থেকেই তাঁর চরিত্রে ধর্ম্মভাব দেখা গেছিল; তিনি ঠাকুর দেবতার পূজো করতে ভালবাস্‌তেন। ছোট বেলায় তিনি খেলা-ধূলারও খুব ভক্ত ছিলেন—তিনি বক্সিং, সাঁতার এবং নৌকা চালানো জান্‌তেন—ঘোড়ায় চড়্‌তেও তিনি খুব ভালবাসতেন। তিনি খুব বীর্য্যবান্ এবং সুপুরুষ ছিলেন। স্বামীজীর আশৈশব সঙ্গীতানুরাগও তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর গলার স্বর খুব মধুর ছিল—পরজীবনে ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে তিনি যে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তাঁর সুমধুর গলার স্বর তাঁকে সে কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। লোকে

স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে যেত। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে তাঁর যখন প্রথম দেখা হয় তখন তাঁর বয়স বোধ হয় আঠারো বছর। কোন একজন বন্ধুর বাড়ীতে পরমহংস-দেবকে তিনি প্রথম দেখেন—সেই সময় পরমহংসদেব নাকি তাঁকে গান গাইতে বলেছিলেন এবং সেই গান শুন্‌তে শুন্‌তে নাকি রামকৃষ্ণদেবের ভাবাবেশ হয়েছিল। বিবেকানন্দ ধীরে ধীরে বড় হ'তে লাগ্‌লেন—ক্রমে তিনি বি-এ পাশ ক'রে আইন পড়বার সংকল্প কর্‌লেন। কিন্তু তাঁর এ সংকল্প কার্য্যে পরিণত হ'ল না। এই সময় তাঁর জীবনে এমন একটা পরিবর্ত্তন এল যার ফলে তাঁর সমস্ত জীবনের ধারাই বদ্‌লে গেল।

পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী জ্ঞানবিজ্ঞান পাঠ ক'রে বিবেকানন্দের মনে নাস্তিকতা প্রবেশ করেছিল। পূর্ব্বেকার সে সরল বিশ্বাস আর ছিল না—ভগবান আছেন কি নেই এই প্রশ্ন তাঁকে নিরন্তর ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল। আস্তিকতা এবং নাস্তিকতার মধ্যে এই সময়ে তাঁর মনে প্রবল দ্বন্দ্ব চলছিল। এই মানসিক বিশৃঙ্খলায় তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন—এই অন্ধকার থেকে আলোতে যাবার জন্য তিনি চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কেউ তাঁকে সত্যিকারের পথ দেখাতে পার্‌ছিল না। এই সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত সুরু করেন—তাতে তাঁর নাস্তিকতা দূর হ'লেও বাল্যের সে সহজ সরল ভগবদ্‌ বিশ্বাস ফিরে এল না। এই সময় তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে সাধক রামকৃষ্ণদেবের কাছে যাতায়াত সুরু কর্‌লেন

এবং তাঁর ধর্ম্মজীবনেও পরিবর্ত্তন সুরু হ'ল। তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে স্বামীজী কি চোখে দেখ্‌তেন তা তাঁর নিজের কথা থেকেই বোঝা যায়ঃ "পৃথিবীতে কোথাও যদি কোন তত্ত্ব-কথা, কোন সত্য আমি প্রচার ক'রে থাকি, তবে তার জন্য আমি গুরুদেবের কাছে ঋণী।" প্রথম দর্শনেই বিবেকানন্দ বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে রামকৃষ্ণদেবই তাঁকে অন্ধকার থেকে আলোতে আন্‌তে পার্‌বেন। বিবেকানন্দের ভিতরে যে অগ্নিশিখা লুকিয়ে ছিল রামকৃষ্ণদেবও তাহা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন কর্‌লেনঃ "আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন?" রামকৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ শিশুর মত সরল ভাবে জবাব দিলেনঃ "আমি তোমায় যেমন দেখ্‌ছি তেমনি তাঁকেও দেখ্‌তে পাই।" তাঁর সরল উত্তরে বিবেকানন্দ বিস্মিত হলেন—এমন কথা কোন ধর্ম্মগুরুর কাছে তিনি ইতিপূর্ব্বে শোনেন নি। সেইদিন থেকে তিনি রামকৃষ্ণদেবের মন্ত্রশিষ্য হলেন। তিনি বুঝ্‌লেন যে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ অনুভূতির জিনিষ—তর্কের নয়। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য দুটো জিনিষের প্রয়োজন—ত্যাগ এবং সর্ব্বধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐক্যবোধ। রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে তিনি এ দুটোই পেলেন। রামকৃষ্ণদেব ছিলেন পরম ত্যাগী এবং তাঁর ধর্ম্ম ছিল বিশ্ব-জনীন। পরজীবনে বিবেকানন্দও হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ব-মানবতার উপাসকঃ তিনি তাঁর এই বিশ্ব-মানবতার ধর্ম্মই দেশে প্রচার ক'রে বেড়িয়েছিলেন। এর পরেই সুরু হ'ল স্বামীজীর ধর্ম্ম প্রচারের জীবন—তিনি গুরুর ধর্ম্মমত বিশ্বের

দরবারে পৌঁছে দেবার ভার নিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট রামকৃষ্ণদেব নশ্বর দেহ ত্যাগ কর্‌লেন। এর কিছুদিন পরেই রামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে বিবেকানন্দ এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করলেন। তিনি নিজে তাঁদের নেতা হলেন। এর পরে ছয় বছর তিনি পরিব্রাজকরূপে সারা ভারত ঘুরে বেড়ালেন—তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে ভবিষ্যতের গুরুভার কার্য্যের জন্য নিজেকে তৈয়ারী ক'রে নিলেন। এই ছয়টি বছরকে স্বামীজীর জীবনের উদ্যোগ-পর্ব্ব বলা চলে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি গরীব অজ্ঞ ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে আমেরিকায় যাবার জন্য মাদ্রাজে এসে পৌঁছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো সহরে একটি বিশ্ব-মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষে একটি বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলনেরও আয়োজন হয়েছিল। এই ধর্ম্ম-সম্মেলনে ভারতের হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি-স্বরূপ যোগ দেবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বোম্বাই থেকে জাপানের পথে আমেরিকা রওনা হন' তিনি সেখানে গিয়ে কি কর্‌বেন তার সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও স্পষ্ট ধারণা ছিল না—তবে তাঁর মনে যে অগ্নিশিখা জ্বলছিল তারই প্রেরণায় তিনি এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। তাঁর অচল ধর্ম্মবিশ্বাসের এবং দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের বলে শেষ পর্য্যন্ত তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন। আমেরিকায় বর্ণ-সমস্যা (colour bar) বড় প্রবল; কালা আদ্‌মিদের সেখানে বহু নির্য্যাতন সহ্য কর্‌তে

হয়। শ্বেতাঙ্গদের কোন হোটেলে তাদের স্থান দেওয়া হ'ত না। স্বামীজীকেও প্রথম খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকার লোকেরা যখন বিবেকানন্দের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুন্‌ল, তাঁর হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শুন্‌ল এবং সর্ব্বোপরি তাঁর বিশ্ব-মানবতা-ধর্ম্ম তাদের মনে আঘাত কর্‌ল. তখন আমেরিকায় স্বামীজীর আদরের অন্ত রইল না। আজও আমেরিকাবাসীরা বিবেকানন্দের দেশের লোক ব'লে ভারতবাসীদের একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে। বিশ্ব-ধর্ম্ম সম্মেলনে লাল রেশমের আলখাল্লা পরা, মাথায় হল্‌দে পাগ্‌ড়ী বাঁধা, উন্নতবপু গৌরাঙ্গ এই তরুণ বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট কর্‌লেন এবং তাঁর স্বভাব সিদ্ধ বক্তৃতা-নৈপুণ্যে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ কর্‌লেন। এই বিশ্ব-ধর্ম্ম সম্মেলনে স্বামীজীই ছিলেন তরুণতম প্রতিনিধি। তিনি ভারতের বেদান্ত উপনিষদের বাণী আমেরিকাবাসীদের শোনালেন—আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড্‌ডীন হ'ল। শ্রোতারা কিরূপ আগ্রহ নিয়ে স্বামীজীর বক্তৃতা শুন্‌ত, আমেরিকার 'বোষ্টন্ ঈভ্‌নিং ট্রান্সক্রিপ্ট্' নামক পত্রিকার নীচের মন্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে: "বিশ্ব-ধর্ম্ম সম্মেলনে শ্রোতারা যাতে শেষ পর্য্যন্ত থাকে সেই জন্য সকলের শেষে বিবেকানন্দের বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হ'ত।" লোকেরা নীরস ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা শুন্‌তে শুন্‌তে বিরক্ত হ'য়ে বাড়ী যেতে চাইলেই সভাপতি তাদের মনে করিয়ে দিতেন যে সকলের শেষে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দেবেন। অমনি

সমস্ত শ্রোতা চুপ ক'রে ব'সে থাকৃত বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনার আশায়! ভেবে দেখ বক্তৃতা শোনার কি অসম্ভব আগ্রহ!

বিবেকানন্দ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত আমেরিকায় থাকলেন—এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেক কাজ করলেন—অনেক আমেরিকাবাসীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করলেন। তিনি দিনরাত অবিশ্রাম পরিশ্রম করতেন—তার মধ্যে বক্তৃতাই ছিল প্রধান—তাঁর কর্ম্মময় জীবনে বিশ্রামের অবসর ছিল না। এই সময় তিনি তাঁর 'রাজ-যোগ' নামক প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। টলষ্টয় এবং উইলিয়াম্ জেম্‌সের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মনীষীরাও নাকি স্বামিজীর এই বইটির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরে বিবেকানন্দ 'জ্ঞান-যোগ', 'ভক্তি-যোগ', 'কর্ম্ম-যোগ' প্রভৃতি আরও অনেক উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।

স্বামীজী আমেরিকা ত্যাগ করে আসার পূর্ব্বে কয়েকবার ইংলণ্ড এবং সুইট্‌জারল্যাণ্ড্ পরিদর্শন ক'রে এসেছিলেন। ইংলণ্ডে জার্ম্মান সংস্কৃতপণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের (Max Muller) সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁর প্রতি স্বামীজীর খুব শ্রদ্ধা হয়েছিল। এই সময় ইংলণ্ডে স্বামীজীর অনেক শিষ্য-শিষ্যা জোটেন। এঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতার নাম ভারতের সবারই কাছে সুপরিচিত। নিবেদিতা ইংরেজ রমণী ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল মার্গারেট্ নোব্‌ল্। হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে নিবেদিতা

স্বামীজীর সঙ্গে কলকাতায় আসেন এবং দরিদ্র দুঃস্থদের সেবায় তাঁর জীবন কাটিয়ে গেছেন।

তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিবেকানন্দ কলম্বোয় এসে পৌঁছিলেন। ইতিমধ্যে সমগ্র ভারতে বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল—পাশ্চাত্ত্য দেশে স্বামীজীর বিজয়-কাহিনী পাঠ ক'রে ভারতবাসীরা আবার তাদের হৃতগৌরব ও আত্ম-মর্য্যাদা ফিরে পেয়েছিল। ফলে কলম্বো থেকে মাদ্রাজ ও সেখান থেকে কলকাতায় বিবেকানন্দ ফিরে গেলেন বিজয়ী বীরের মত। সর্ব্বত্রই তিনি বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হ'তে লাগ্‌লেন। ভারতে ফিরে এসে বিবেকানন্দ সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তিনি এখন তাঁর প্রিয় মাতৃভূমির দিকে নজর ফেরালেন—কি ক'রে স্বদেশের উন্নতি কর্‌বেন। এই হ'ল তাঁর একমাত্র চিন্তা! তিনি তাঁর মূর্খ দরিদ্র স্বদেশবাসীদের উন্নত করার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'লেন। তিনি দেখলেন যে জাতীয় উন্নতি কর্‌তে হ'লে জাতিকে অন্ধ কুসংস্কারের হাত থেকে আগে বাঁচাতে হবে। তিনি দেখ্‌লেন যে তাঁর স্বদেশবাসীরা মৃত-কল্প, তারা আত্ম-বিস্মৃত—মিথ্যা লোকাচার এবং কুসংস্কারের বেড়াজালে তারা আবদ্ধ। 'ছত্রিশ জাতে ছত্রিশ ভাগ' হ'য়ে জাতি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। তাই তাদের সম্বোধন ক'রে তিনি বললেন: আমাদের জাতিটা নিজের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেই জন্যই ভারতে এত দুঃখ কষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে। নীচ জাতকে তুল্‌তে হবে;

হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের ওঠাবার যে শক্তি তাও আমাদের নিজেদের মধ্য থেকে আন্‌তে হবে—খাঁটি-হিন্দুদের এ কাজ কর্‌তে হবে।" ভারতের এই বীর সন্তান দেশবাসীকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন: "বীর্য্য,—বীর্য্যই সাধুত্ব, দুর্ব্বলতা পাপ।...বীর্য্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিকে উহা বদ্‌লাইয়া সবল মস্তিষ্ক হইতে হইবে। তোমরা সবল হও, গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইবে।" আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে যে স্বামীজী যখন এই সব কথা বলেছিলেন তখনও ভারতীয় কংগ্রেসের নিতান্ত শৈশব অবস্থা। স্বামীজীর স্বদেশপ্রেম যে কত প্রবল ছিল তা আমরা তাঁর এই বাণীগুলো থেকেই বুঝ্‌তে পারি! মহাত্মা গান্ধীকে আমরা অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলনের গুরু ব'লে জানি—কিন্তু বিবেকানন্দ এই অস্পৃশ্যতারও মূলে বহুকাল পূর্ব্বে কুঠারাঘাত করেছিলেন। নীচজাতিকে তিনি অপরিসীম ভাল বাস্‌তেন। একদিন যে তথাকথিত নীচজাতিই ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের পুরোহিত হবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাই তিনি উচ্চবর্ণদের সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন: "তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধ'রে চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের চুপ্‌ড়ির মধ্য হ'তে বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক্ কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।" এমন জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের বাণী আর কার মুখ থেকে শুনেছি?

স্বামীজীর মতে সেবা ধর্ম্মই ছিল সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। তিনি দরিদ্রের নাম দিয়াছিলেন 'দরিদ্র-নারায়ণ': এই দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বলতেন —"আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ্ নরকে যাব; বসন্তবল্লোক হিতং চরন্তঃ' (বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করা) এই আমার ধর্ম্ম।" স্বামী বিবেকানন্দ যেমন জ্ঞানযোগী ছিলেন তেমনি ছিলেন তিনি কর্ম্মযোগী। তিনি বুঝেছিলেন যে দেশবাসীদের মানুষ কর্‌তে হলে চাই পরহিতব্রতী সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর দল। এই রকম পরহিতব্রতী সন্ন্যাসী তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি অর্থ সংগ্রহ ক'রে তাঁর গুরুর নামে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা কর্‌লেন—কল্‌কাতার কাছে বেলুড়ে এবং হিমালয়ের কোলে মায়াবতীতে দুইটি কেন্দ্রীয় মঠাশ্রম স্থাপন কর্‌লেন। বিবেকানন্দ-প্রবর্ত্তিত রামকৃষ্ণ মিশন আজ যে দেশের এবং দশের কি উপকার কর্‌ছে তা বলে শেষ করা যায় না। সুদূর আমেরিকায়ও এঁদের অনেক শাখা-প্রতিষ্ঠান আছে।

কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমে বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়্‌ছিল—বিশ্রাম এবং বায়ু-পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্ত্য দেশের উদ্দেশে যাত্রা কর্‌লেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। পাশ্চাত্ত্য দেশে তাঁর দ্বিতীয় বারের অভিজ্ঞতা তাঁর 'পরিব্রাজক' নামক গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ আছে। পারস্পরিক আদান-প্রদান ছাড়া যে কোন জাতি উন্নত হয় না তা তিনি বুঝ্‌তেন—তাই এক জায়গায় বলেছেন: "ইউরোপের কাছ থেকে ভারতের শিখ্‌তে হবে বহিঃপ্রকৃতির জয়, আর

ভারতের কাছ থেকে ইউরোপের শিখ্‌তে হবে অন্তঃপ্রকৃতির জয়। তা হ'লে আর হিন্দু ইউরোপীয় ব'লে কিছু থাক্‌বে না, উভয় প্রকৃতি-জয়ী এক আদর্শ মনুষ্যসমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের এক দিক, ওরা আর এক দিক বিকাশ কর্‌ছে। এই দুইটির মিলনই দরকার।" এই দ্বিতীয় বারও বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য জগতে অনেক বক্তৃতা দিলেন কিন্তু প্রথমবারের সে অগ্নি-শিখা নিভে আস্‌ছিল—স্বামীজী নিজেও বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে তাঁর জীবনের কাজ শেষ হ'য়ে এসেছে। যা হ'ক ক্যালিফোর্ণিয়ার নির্ম্মল আবহাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যোন্নতি হ'ল—তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বদেশে ফিরে এলেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি কিন্তু ব'সে রইলেন না— তিনি তাঁর প্রবর্ত্তিত রামকৃষ্ণ মিশনের উন্নতির জন্য আত্ম-নিয়োগ কর্‌লেন। অবিরাম কাজের ফলে পুনরায় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল—১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই এই আত্মত্যাগী কর্ম্মবীর বেলুড় মঠে দেহরক্ষা কর্‌লেন। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনে তিনি যে অপরিসীম দান ক'রে গেছেন তার কথা কেউ কোনদিন ভুল্‌তে পার্‌বে না। এই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।
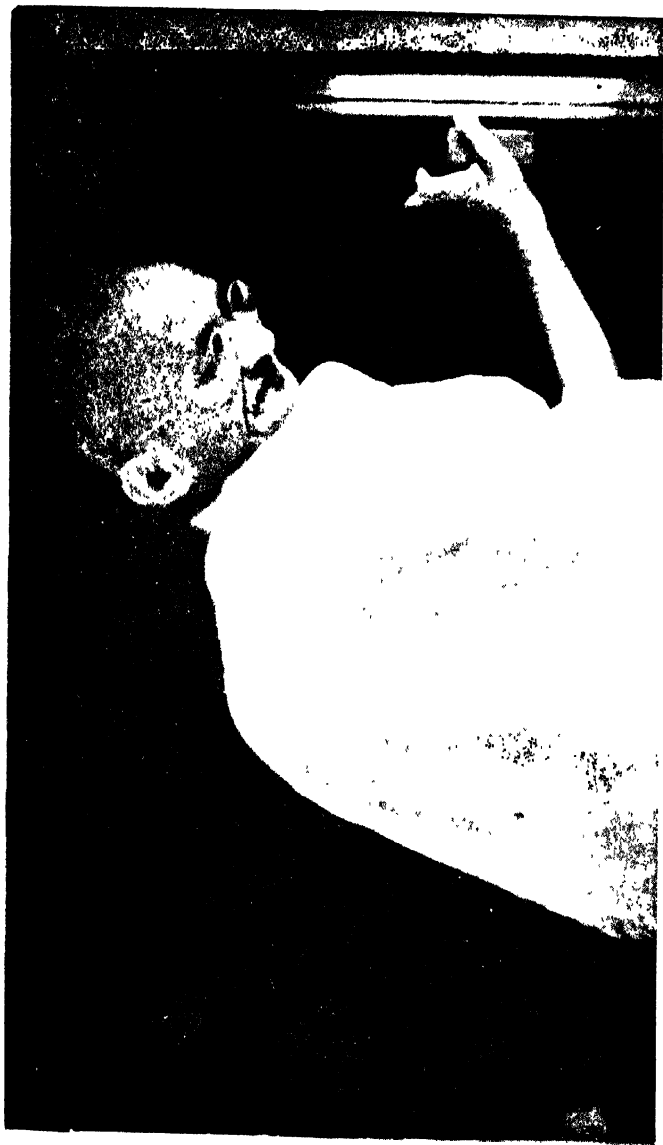
মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—ভারতের বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব কে, তবে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সবাই একযোগে উত্তর দেবে—মহাত্মা গান্ধী। শুধু ভারতেই বা কেন, মহাত্মা গান্ধী যে বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। পরাধীন ভারতবর্ষের জন-মনের উপর তাঁর যে প্রভাব, সচরাচর তার তুলনা মেলে না। এই প্রভাবের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর পিছনে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের নৈতিক উৎকর্ষ আছে, তেমনই আছে দেশের জন্য, জাতির জন্য তাঁর অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এমন এক একটি লোকের সন্ধান মেলে যাঁরা প্রচলিত জীর্ণ সমাজব্যবস্থা এবং অন্যায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্যে এগিয়ে আসেন। এই বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবার জন্যে তাঁদের অপরিসীম আত্মত্যাগ করতে হয়, সইতে হয় ভীষণ লাঞ্ছনা এবং নির্য্যাতন। কিন্তু কোন ভয় কিংবা দুঃখই তাঁদের অগ্রগতি বন্ধ করতে পারে না। নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভর ক'রেই তাঁরা অজ্ঞ জনসাধারণকে নতুন পথে চালিয়ে নিয়ে যান। মহাত্মা গান্ধীও এই শ্রেণীর যুগপ্রবর্ত্তনকারী মানুষ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর নাম ও তাঁর আজীবনের সাধনা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর পশ্চিম ভারতের ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য পোরবন্দরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতা পোর-বন্দরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গান্ধীজীর ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতা কাথিয়াবারের রাজকোটের দেওয়ান হয়ে-ছিলেন। গান্ধী-পরিবার জাতিতে বৈশ্য। গান্ধীজী ছিলেন পিতামাতার কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর পিতা দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান হলেও অভিজ্ঞতা ছাড়া তাঁর অন্য কোন শিক্ষা দীক্ষা ছিল না—মহাত্মাজী তাঁর আত্মজীবনীতে একথা নিজেই লিখেছেন। বাল্যজীবনে পিতার চেয়ে মাতার চরিত্রই গান্ধীজীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল বেশী। তিনি মাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং চরিত্রের স্নিগ্ধতা, স্বাভাবিক জ্ঞান ও সুগভীর ধর্ম্মবোধ প্রভৃতি যে সব গুণ তাঁর মাতার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, গান্ধীজীও সে সবের অধিকারী হয়েছেন। হয়ত মাতার প্রতি এই ভালবাসা থেকেই পর-জীবনে গান্ধী-চরিত্রের বিশ্ব-জনীন মানব-প্রীতি দেখা দিয়েছে। যে মানুষ অত্যাচারিত, যে মানুষ নিপীড়িত, তার প্রতি মহাত্মাজীর ভালবাসার অন্ত নেই। সেই যুগের দেশীয় প্রথা অনুসারে মাত্র ৭ বৎসর বয়সেই গান্ধীজীর বাক্‌দান এবং ১৩ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী দেশবরেণ্যা শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধী তাঁর চেয়ে ছয়মাসের বড় ছিলেন। গান্ধীজীর পত্নী লেখাপড়া জানতেন না বটে—তবে তাঁর চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি শুধু স্বামীর

সহধর্ম্মিণী ছিলেন না, সহকর্ম্মিণীও ছিলেন। প্রথম জীবনে গান্ধীজীর ধারণা ছিল যে তাঁর পত্নী তাঁর নিজের জিনিস; তাঁকে যে কোন প্রকারে ভেঙে গড়ার অধিকার তাঁর আছে। শ্রীযুক্তা গান্ধী ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারী ছিলেন ব'লে প্রথম প্রথম এই প্রচেষ্টায় বাধা দেবার চেষ্টা করতেন—শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য স্বামীর সন্তুষ্টিবিধানের জন্যে সব কিছুই মেনে নিতেন। মহৎ ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার মধ্যে সুখ যেমন আছে তার মধ্যে দুঃখ তেমনই আছে। একবার কে একজন শ্রীযুক্তা কস্তুর-বাঈর মারফৎ গান্ধীজীর হরিজন ফণ্ডে চার আনা পয়সা চাঁদা দিয়েছিলেন। তিনি যথাসময়ে এই চাঁদা জমা দিতে ভুলে গিয়াছিলেন বলে পরে গান্ধীজীর নির্দ্দেশে তাঁকে এর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত করতে হয়েছিল।

বিবাহের পরেই গান্ধীজীর প্রথম জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর বিলাত গমন। ১৮ বৎসর বয়সে ব্যারিষ্টারী পড়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে যখন বিলাতে পাঠান হয়, তখন তিনি মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছলেন যে বিলাতে তিনি কোনদিন মাংস মদ্যাদি ভক্ষণ করবেন না। বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী তাঁদের পরিবারের সকলেই ছিলেন নিরামিষাশী। গান্ধীজী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকে প'ড়ে,—নিজের মনের সঙ্গে নিজে লড়াই ক'রে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন—কিন্তু একদিনের জন্যেও নিজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নি। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর এই মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্র চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথম প্রথম বিলাতের আবহাওয়া এবং

পারিপার্শ্বিক তাঁর ভাল লাগত না—তাঁর বাড়ী ফিরে যাবার ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু লেখাপড়া সমাপ্ত না ক'রে বাড়ী ফিরে গেলে যে ভীরুতা দেখান হবে, গান্ধীজীর মত দৃঢ়-চরিত্রের লোক সে ভীরুতার প্রশ্রয় দিতেও রাজী ছিলেন না। ধীরে ধীরে সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে তিনি পড়াশুনোয় মনোনিবেশ করলেন—এমন কি সাহেবী পোষাক পর্য্যন্ত পরিধান করতে বাধ্য হলেন—কেননা ব্যারিষ্টারী পড়তে হ'লে উচ্চস্তরের সাহেবী সমাজে বিচরণ না ক'রে উপায় নেই। গান্ধীজীর পোষাক পরিচ্ছদ চিরদিনই প্রতীক হিসাবে কাজ করেছে বলা চলে। তিনি কখনও পোষাককে সাধারণভাবে গ্রহণ করেন নি। আজ যে মহাত্মাকে আমরা চিনি, তিনি হাঁটু পর্য্যন্ত মোটা ধুতি পরেন আর গায়ে জড়ান একটা চাদর। এর কারণ আর কিছুই নয়—তিনি আজ ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে একীভূত ক'রে ফেলেছেন—তাই তিনি তাদের পোষাক গ্রহণ করেছেন। গান্ধীজীর বাল্য ও কৈশোর জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে পরজীবনে তাঁর চরিত্রে যে সব গুণের বিকাশ দেখা যায়, সে সবের বীজই প্রথম থেকে তাঁর চরিত্রে উপ্ত ছিল। গান্ধীজী নিজেকে সত্যান্বেষী বলে অভিহিত করেছেন; ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চরিত্রে আমরা সত্যপ্রিয়তা দেখতে পাই। এছাড়া স্বদেশপ্রীতি, সরল জীবন যাপন, সাধারণ লোকের প্রতি দরদ, সহজ ধর্ম্ম এবং পবিত্রতা-বোধ, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং সৎসাহস প্রভৃতি গুণগুলো প্রথম থেকেই তাঁর চরিত্রে শিকড় গেড়েছিল।

বিলাতে তাঁর আইন-বিষয়ক পড়াশুনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই। তিনি উদ্যমী এবং পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। যথাসময়ে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় পাশ ক'রে তিনি স্বদেশে ফিরে এসে অতর্কিতে মাতার মৃত্যু সংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছিল; কিন্তু বিদেশে বিভূঁয়ে তাঁর মানসিক কষ্ট এবং পড়াশুনোর ব্যাঘাত হ'তে পারে বলে তাঁকে মৃত্যুসংবাদ জানানো হয় নি। এই দুঃসংবাদে মাতৃভক্ত গান্ধীজী কি অসম্ভব ব্যথা পেয়েছিলেন তা বলা যায় না। তার উপর স্বদেশে ফিরে দেখেন যে তিনি বিলাত যাবার অপরাধে সমাজে জাতিচ্যুত। হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত পদ্ধতিতে প্রায়শ্চিত্ত করা সত্ত্বেও তাঁকে সহজভাবে সমাজে গ্রহণ করা হয় নি। এতে তিনি একটুও মর্ম্মাহত হন নি—বরং জাতিপ্রথা যে কত কৃত্রিম এবং ফাঁকা সেই সত্যটি তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন। পরজীবনে যে সারা ভারতব্যাপী অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, তার প্রথম প্রেরণা পেয়ে-ছিলেন এইখান থেকেই। দৃঢ়-চরিত্র গান্ধীজী সবকিছু দুঃখ কষ্ট অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করেছিলেন। অনেক দ্বিধা সঙ্কোচের পর তিনি বোম্বাইয়ের আদালতে আইন-ব্যবসায় সুরু করে-ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম মামলায় কিছুতেই তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার সাহস পান নি। যে গান্ধীজী আজ লক্ষ লক্ষ লোকের বিরাট জনসভায় অক্লেশে বক্তৃতা দিয়ে যান, একদিন তাঁর এ দুরবস্থা হয়েছিল একথা কি সহজে

ভাবা যায়? অথচ একথা পরম সত্য এবং গান্ধীজী তাঁর অপরিসীম মানসিক শক্তির দ্বারাই শেষ পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেবার অক্ষমতাকে জয় করেছিলেন। যাই হোক, সাধারণভাবে আইন ব্যবসা ক'রে স্বাভাবিক জীবন যাপন করার জন্যে ত তাঁর জন্ম হয় নি। কিছুদিন পরেই তাঁর জীবনে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার একটা সুযোগ এসেছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার পর থেকেই গান্ধীজীর প্রকৃত রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। ইংরাজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খৃঃ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয় সমাজের উন্নতির জন্যে গান্ধীজী যে অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ করেছিলেন, তার স্মৃতি আজও দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে তাকে জীবন্ত দেবতা করে রেখেছে। আজ আমরা যে মহাত্মা গান্ধীকে পেয়েছি, দক্ষিণ আফ্রিকাতেই সর্ব্বপ্রথম তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ হয়েছিল। একদিক থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়া গান্ধীজীর ভাগ্যের নির্দ্দেশ বলা চলে। একটা ভারতীয় কোম্পানী দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি মামলায় বিজড়িত ছিলেন, তারা এক বছরের জন্যে গান্ধীজীকে তাদের আইনবিষয়ক প্রতিনিধিরূপে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি তখন চব্বিশ বৎসর বয়সের তরুণ আইনজীবী, তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের বিকাশও হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার কালা আদমি নির্য্যাতনের কাহিনী তিনি জানতেন না। তাঁর মক্কেলরা ধনী ছিলেন; গান্ধীজী মনে ভেবেছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ত বা সূর্য্যকরোজ্জ্বল সমৃদ্ধির দেশ। এই

মনোভাব নিয়েই তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সস্ত্রীক ডারবান্ সহরে পদার্পণ করেছিলেন—ভেবেছিলেন সবারই কাছ থেকে ভাল ব্যবহারই পাবেন। ভারতে থাকতেই শ্বেতজাতির ঔদ্ধত্যের পরিচয় তিনি কিছু কিছু না পেয়েছিলেন তা নয়; তবে অতি সামান্যই। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ভীষণ বর্ণ বৈষম্য আজ পর্য্যন্ত চ'লে আসছে তার কোন খবরই তিনি রাখতেন না। কিন্তু এখানে পদার্পণ করেই তিনি সব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতীয়দের সেখানে শ্বেতাঙ্গরা কুকুরের চেয়েও অধম জ্ঞান করে। সাহেবেরা মনে করে যে ভারতীয় মাত্রই 'কুলি'; এমন কি গান্ধীজীকে পর্য্যন্ত বলা হ'ত 'কুলি ব্যারিষ্টার'। ভারতীয়দের প্রতি এই অন্যায় অত্যাচার দেখে গান্ধীজীর সাম্যবাদী মন বিদ্রোহ ক'রে উঠল। তাই তাঁর মক্কেলদের কাজ ভালভাবে সমাপ্ত করার পরও তাঁর পক্ষে ভারতে ফিরে আসা সম্ভব হ'ল না; ন্যাটাল এবং অন্যান্য অঞ্চলের ভারতীয়রা এসে গান্ধীজীকে অনুরোধ করল যে তারা যাতে তাদের ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক অধিকার পেতে পারে, সেই চেষ্টা করার জন্যে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকুন। সত্যান্বেষী গান্ধীজীর পক্ষে সেদিন তাঁদের আবেদনে সাড়া না দিয়ে উপায় ছিল না। গান্ধীজী তখন ডারবানেই ব্যারিষ্টারী সুরু করলেন; অবশ্য আইন-ব্যবসায়ের চেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী স্বদেশবাসীদের পক্ষ নিয়ে অত্যাচারী শাসক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে লড়াই করাই হ'ল তাঁর প্রধান কাজ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের দিকে যখন দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাটাল উপনিবেশটিতে দেশীয়

শ্রমিকদের অভাব হয়েছিল, তখন ভারতবর্ষের যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশ থেকে ভারতীয়দের কুলির কাজ করার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমদানী করা হয়েছিল। কিছুদিন পরে এই সব ভারতীয় সেখানকার অধিবাসী হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভারতীয় কুলিদের পিছনে পিছনে বোম্বাই এবং গুজরাট থেকে অনেক ব্যবসায়ীও দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিল। কিন্তু জাতিবর্ণ নির্বিবশেষে এদের সবাইকেই শ্বেতাঙ্গরা কুলি বলত, তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত—এমন কি এদের সামান্য নাগরিক অধিকার পর্য্যন্ত ছিল না। এশিয়াবাসী-বিরোধী নানাপ্রকার আইন প্রণয়ন করে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের জীবন দুর্বিবষহ করে তুলেছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা ক'রেও এ অবস্থার কোন প্রতিকার করতে পারেন নি। গান্ধীজী এই সময় আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ন্যাটাল ভারতীয় কংগ্রেস স্থাপন ক'রে নিজে তার অবৈতনিক সম্পাদক হ'য়ে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করেছিলেন। তাতেও কোন ফল হয় নি। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের কথা ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের কাছে নিবেদন করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজীকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। ইতিমধ্যে ভারতীয়দের মুখপাত্র হিসাবে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল

হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; শ্বেতাঙ্গচালিত পত্রিকাদিতে তাঁর সেবাব্রতী এবং স্বজাতি-হিতৈষী কাজ-কর্ম্মের অপব্যাখ্যা করা হ'ত। তাই পরবৎসর তিনি যখন ভারত থেকে ডারবানে ফিরে আসেন, তখন শ্বেতাঙ্গদের একটি বিরাট জনতার দ্বারা তিনি লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হন। কিন্তু লাঞ্ছনা বা অপমানে দমবার পাত্র গান্ধীজী নন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের বুয়োর যুদ্ধের সময় রাজভক্ত প্রজার মত গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অনেক সাহায্য করেছিল। ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এ সাহায্যের জন্যে কৃতজ্ঞতা পর্য্যন্ত স্বীকার করেছিলেন। এরপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে ভারতে ফিরে এসেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে বোম্বাইতে পুনরায় বসবাস সুরু করবেন। কিন্তু নিয়তির নির্দ্দেশ ছিল অন্যরকম। আবার প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে আবেদন এল ফিরে যাবার। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখেন বুয়োর যুদ্ধে ব্রিটিশদের জয় হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয়দের পূর্ব্ব দুরবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে ভারতীয়দের পক্ষাবলম্বন করে বুয়োর গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রতিবাদ করতেন, তাঁরাই এখন ভারতীয়-দলনে নিযুক্ত। গান্ধীজী পুনরায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে রুখে দাঁড়ালেন। নতুন নতুন সঙ্ঘ স্থাপন ক'রে তিনি ভারতীয় জনমত গঠনে ব্রতী হলেন। এই সময় একটি ছাপাখানা ও Indian Opinion (ভারতীয়

জনমত) নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তিনি জোর আন্দোলন স্বরু করলেন। এই সময় ধীরে ধীরে বাইবেল, শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা, টলসটয়ের রচনাবলী প্রভৃতির প্রভাব তাঁর চরিত্রে দেখা যাচ্ছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি আন্দোলনের প্রেরণা জোগাতে এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষা করতে গান্ধীজীকে প্রচুর সাহায্য করেছিল। এই সময় ভারতীয় বিরোধী 'কালো আইন' (Black Act) পাশ করা নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে ট্রান্স্ভাল গভর্ণমেণ্টের দারুণ বিরোধ স্বষ্টি হয়। গন্ধীজীর নেতৃত্বে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যে জোহানেস্-বার্গে এক বিরাট জন-সভার অধিবেশন হয় এবং স্থির হয় যে ভারতীয়দের পক্ষে অপমানজনক এই আইন গ্রহণ না করে, তারা সত্যাগ্রহ করবে এবং প্রয়োজন হ'লে কারাবরণ পর্য্যন্ত করবে। ট্রান্সভালের আইন সভায় আইনটি পাশ হ'য়ে যায়; শুধু রাজার অনুমোদন পেলেই সেটি কার্য্যে পরিণত হ'তে পারে। এই আইনটি যাতে রাজানুমোদন লাভ না করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে দরবার করার জন্যে গান্ধীজী এবং তাঁর এক সহকর্মীকে বিলাতে পাঠানো হয়। লণ্ডনে তাঁদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেশ্বর আইনটি অনুমোদন কর্তে অস্বীকার করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের এই বিজয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মনে প্রবল বিক্ষোভের স্বষ্টি হয়। এর কয়েক মাস পরে ট্রান্স্ভালে যখন দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন

তাঁরা নতুন চেষ্টা ক'রে আবার আইনটি পাশ করিয়া নেন। এবার বহু চেষ্টা ক'রেও রাজানুমোদন ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তখন ভারতীয় সম্প্রদায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে সুপ্রসিদ্ধ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করলেন; গান্ধীজী এবং অপর কয়েকজন নেতাকে কারাবরণ কর্‌তে হ'ল। কিন্তু অভিযান পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। বোথা গভর্ণমেণ্ট অন্যতম মন্ত্রী জেনারেল্ স্মাট্‌সের মধ্যস্থতায় তখন আপোষের চেষ্টা করতে লাগলেন। বহু চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত গান্ধী-স্মাট্‌স চুক্তি সম্পাদিত হ'ল। কিন্তু এ চুক্তির ফলও হ'ল অত্যন্ত সাময়িক। কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে ট্রান্স্‌ভাল গভর্ণমেণ্ট চুক্তির সর্ত্ত মানছেন না— তাই আবার ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করা হ'ল। গান্ধীজী, তাঁর স্ত্রী এবং বহু সহস্র ভারতীয় বারবার ক'রে কারাবরণ করলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্ব্বে এই আন্দোলন থামে নি, সেই সময় গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়ে 'কালো আইন' প্রত্যাহার করেন এবং ন্যাটালের ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর থেকে তিন পাউণ্ডের বার্ষিক করটিও রদ করা হয়। এই সময় গান্ধীজীর সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের অনেকটা উন্নতি হয়। ইতিমধ্যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যান এবং ফিরে এসে তাঁর রাজনৈতিক মতামত সম্বলিত "হিন্দ্‌ স্বরাজ" (Indian Home Rule) নামক পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ভারতীয় নেতা মিঃ জি, কে, গোখলে দক্ষিণ

আফ্রিকায় গেলে ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে ভারতীয়দের উপর থেকে তিন পাউণ্ডের বার্ষিক করটি উঠিয়ে দেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে পালিত না হওয়ার প্রতিবাদ স্বরূপ গান্ধীজীর নেতৃত্বে ন্যাটালের ভারতীয় কুলি সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় কারাবরণ করার জন্যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ট্রান্স্‌ভালে অহিংস অভিযান করে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়দের দাবী শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্ট মেনে নেওয়ায়, গান্ধী নিজেকে মুক্ত মনে করেন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। স্বদেশ সেবায় গান্ধীজীর জীবনে নতুন স্বার্থত্যাগ ও আত্মনিবেদনের আর এক যুগ সুরু হল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গান্ধীজী ভারতে ফেরার পথে ইংলণ্ডে যান। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ-সেবক গোখলের মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কার্য্যাবলীর জন্যে তিনি স্বদেশে ইতিমধ্যেই প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছিলেনন। জন সাধারণের হৃদয়ে তাঁর আসন এত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে তারা তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধি দিয়েছিল। ভারতে ফিরেই তিনি ভারতের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করার জন্যে এক বৎসর ভারত ভ্রমণ ক'রে বেড়ালেন। ভ্রমন শেষে গান্ধীজী আহমদাবাদের নিকটে সবরমতী আশ্রম স্থাপন ক'রে বাস করা সুরু করলেন। একদল স্বার্থত্যাগী নরনারী যাঁরা গান্ধীজীর সহজ সরল জীবনাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও এসে আশ্রমে

জুটলেন। শীঘ্রই একটা সমস্যা দেখা দিল—একদল অস্পৃশ্য লোক এসে গান্ধী আশ্রমে প্রবেশাধিকার চাইল। ন্যায় ও সত্যের পূজারী গান্ধীজীর পক্ষে আশ্রমে তাদের প্রবেশাধিকার না দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে উঠল এবং আশ্রমের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি কমে গেল। কিন্তু গান্ধীজী ত আর এত সহজে দমবার পাত্র নন। জীবনে তিনি যাকে ন্যায় ও সত্য ব'লে মনে করেন, শত লাঞ্ছনা এবং নির্য্যাতনের সম্ভাবনাও তাঁকে তা থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। ইত্যবসরে ভারত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলি রপ্তানীর বিরুদ্ধে ভারতে আন্দোলন সুরু হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সুকঠোর অভিজ্ঞতা নিয়ে ক্রমে গান্ধীজীও সে আন্দোলনে যোগ দিলেন। দুই তিন বৎসরের আন্দোলনের ফলে যুদ্ধের পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত থেকে কুলি প্রেরণ বন্ধ হ'য়ে গেল। তাঁর আত্মত্যাগে এবং আত্ম-শক্তিতে জনসাধারণের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে গভর্ণমেণ্টের কিংবা ধনী সম্প্রদায়ের কোন অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে হলেই তারা গান্ধীজীর শরণাপন্ন হ'ত। শীঘ্রই বিহারের নীলকর এবং নীল চাষীদের একটা বিবাদ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে গান্ধীজীকে কারাবরণ করতে হ'ল। অবশ্য তাঁর প্রচেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত নীলচাষীদেরই জয় হল। ভারতীয় কৃষক দের অবস্থার উন্নতি বিধান গান্ধীজীর জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এমনি করেই তাঁর সেই কাজ সুরু হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে আহমদাবাদের মিল-মালিক এবং শ্রমিকদের

মধ্যে একটা বিরোধ সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বন করে গান্ধীজী সর্ব্বপ্রথম অনশন সুরু করেন। এর পরে তিনি রাজনৈতিক বিবাদ বিসংবাদ উপলক্ষে বহুবার অনশন করেছেন। তাঁর অনশন ফলপ্রসূ হয়েছিল—শ্রমিকদের অনেক ন্যায়সঙ্গত দাবী কর্ত্তৃপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মিলের ধর্ম্মঘট শেষ হ'তে না হ'তেই কৈরা জেলার কৃষকদের পক্ষাবলম্বন ক'রে গান্ধীজীকে সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হ'ল। সেবার এই জেলায় শস্যাদি না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল—সরকারী খাজনা দেবার মত ক্ষমতা প্রজাদের ছিল না। গান্ধীজী তাঁদের হ'য়ে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করলেন—ফল হ'ল না। তখন নিরুপায় হয়ে তিনি প্রজাদের উপদেশ দিলেন : "তোমরা খাজনা দিও না।" এর একটা বিষম প্রতিক্রিয়া এই হল যে সরকার থেকে দরিদ্র প্রজাদের মালপত্র ক্রোক করা হ'ল এবং তাদের আবাদী জমি কেড়ে নেওয়া হ'ল। যে সব জমি সরকার নিয়েছিলেন, সে সব জমি থেকে শস্যাদি কেটে আনার জন্যে গান্ধীজী তার অনুগত শিষ্যদের উপদেশ দিলেন। এই উপদেশ অনুসরণ ক'রে অনেকেই কারাবরণ করেছিল। এর ফল কিন্তু খুব ভালই হয়েছিল—শীঘ্রই সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কৈরার কৃষকদের সঙ্গে সম্মানজনক সর্ত্তে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কৈরার আন্দোলন ক্ষুদ্র হ'লেও ভারতের জন-জাগরণের ইতিহাসে এ আন্দোলনের স্থান অনেক উঁচুতে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন মহাত্মা গান্ধীর জীবনের অন্যতম প্রধান স্বপ্ন। এই সাধু উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি মহম্মদ আলী

এবং সৌকৎ আলী নামক প্রসিদ্ধ আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খিলাফৎ আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থন করেছিলেন। ব্যক্তিগত ভাবেও তাঁর কাছে হিন্দুদের গীতা, মুসলমানদের কোরাণ এবং খৃষ্টানদের বাইবেল—সমান আদর পেয়ে থাকে। গান্ধীজীর এই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদারতার জন্যেই তাঁর মুসলমান ভক্তের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে কম নয়। ১৯১৪-১৯১৮র বিশ্বযুদ্ধে ভারত-বাসীরা অকাতরে ইংরেজদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করেছিল। সকলেই আশা করেছিল যে প্রতিদানে যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতকে অনেকটা স্বাধীনতা দেবেন। কিন্তু কার্য্যত দেখা গেল যুদ্ধের শেষে মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের নূতন শাসনসংস্কারে ভারতীয়দের হাতে প্রকৃত কোন শাসন ক্ষমতাই দেওয়া হ'ল না। তা ছাড়া জালিয়ানওয়ালাবাগে পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট নিষ্ঠুর ভাবে নিরস্ত্র জনতার উপর যে গুলি চালালেন, তার ফলেও দেশবাসীরা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর আরও বিরূপ ভাবাপন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। ভারতবাসীদের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এই জাতীয় অন্যায় অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা ক'রে গান্ধীজী তাঁর Young India নামক সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ লিখে ভারতীয় জনমতকে গড়ে তুলতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ ক'রে অসহযোগ আন্দোলনের জন্যে তৈরী হ'তে লাগলেন। গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে সারা ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন করাই স্থির হ'ল। মহাত্মাজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই আন্দোলন

সফল হ'লে গভর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহে পঙ্গু হ'য়ে পড়্‌ত। কিন্তু কার্য্যত তা হয় নি। অনেক দেশকর্মী কারাবরণ করেছিলেন এবং সারা ভারতব্যাপী আন্দোলনও চলেছিল বটে—কিন্তু জনগণ গান্ধীজীর অহিংসার তাৎপর্য্য না বুঝে অনেক ক্ষেত্রে হিংসার অনুষ্ঠান ক'রে বসেছিল। তা ছাড়া নেতাদের মধ্যেও অনেকে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। এ অবস্থায় গান্ধীজীর পক্ষে আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে জনগণের সংগঠনে মনোনিবেশ করা ছাড়া উপায় ছিল না। তাই তিনি পল্লীপ্রাণ ভারতীয় জনগণের সামাজিক এবং অর্থ-নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য দৃঢ়-সংকল্প হলেন। তিনি জনগণকে চরকা কাটা, খদ্দর পরা এবং মদ্যপান না করায় উৎসাহিত করতে লাগলেন—অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান সুরু করলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সংস্থাপনের জন্য দিল্লীতে অনশন করেছিলেন এবং সেই বৎসরই তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর Young India পত্রিকা বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায় এই সময় তিনি 'হরিজন' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের লবণ আইন অমান্য আন্দোলন গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতবর্ষে লবণের উপর নির্দ্ধারিত শুল্ক থাকায় গরীবদের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে। অথচ ভারতের সমুদ্র-তীরের যারা অধিবাসী তারা বিনা শুল্কে সমুদ্রের জল থেকে সস্তা দামে লবণ তৈরী করুক

গভর্ণমেণ্ট তা চায় না। গান্ধীজী নিজে লবণ তৈরী ক'রে সরকারী আদেশ ভঙ্গের জন্যে ডাণ্ডির সমুদ্র তীরের দিকে যাত্রা করেছিলেন। পথিমধ্যে ধৃত হ'য়ে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। শীঘ্রই তাঁর আদর্শে সারা ভারতব্যাপী লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল।

এই সময়ে বিলাতে ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের গোল টেবিল বৈঠক চল্‌ছিল। ভারতীয় কংগ্রেস প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেয় নি—অথচ কংগ্রেসের সমর্থন ব্যতীত ভারতে শাসনতন্ত্র চল্‌বে না—এ সংবাদও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট রাখতেন। তাই গান্ধীজী কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পরই বড়লাট লর্ড আরউইন তাঁকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করেন এবং অনেক আলাপ আলোচনার পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয়। সাময়িকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত থাকে এবং করাচী কংগ্রেসে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর এই চুক্তি গৃহীত হয়। এই চুক্তির ফলে গান্ধীজীকে ভারতীয় কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্যে লণ্ডনে যেতে হয়েছিল। লণ্ডনে গিয়েও তিনি দরিদ্র শ্রমিকদের সঙ্গে সাধারণভাবে বাস করতেন এবং হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি প'রে ও শাল গায়ে দিয়েই তিনি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে আবার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ সুরু

হ'য়ে গেছে। লর্ড আরউইনের পরবর্ত্তী লাট গান্ধী-আরউইন চুক্তি অমান্য ক'রে অনেক কংগ্রেস নেতাকে কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন। প্রতিকারের জন্যে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করায় তাঁহাকেও কারাবরণ করতে হ'ল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা ক'রে হিন্দু সমাজকে বর্ণ হিন্দু এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ে ভাগ ক'রে দেন। এই অবিচারের প্রতিরোধকল্পে মহাত্মাজী কারাগারেই তাঁর "আমরণ অনশন' সুরু করেন। এই অনশনের ফলে সমগ্র দেশে গভীর উদ্বেগের ছায়া পড়ে। মহাত্মাজীর জীবন বাঁচানোর জন্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের নেতারা একটা পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও সেই চুক্তি মেনে নেন। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হওয়ায় তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজকোটেও গান্ধীজী এইরূপ একটি "আমরণ অনশন" সুরু করেছিলেন। অবশ্য কিছুদিন অনশন করার পর যখন দেখা গেল যে তাঁর অনশনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তখন তাঁকে অনেক বুঝিয়ে অনশন থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল। রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে অনশন গান্ধীজীর জীবনের নিত্য সহচর বলা চলে। তাঁর বিশ্বাস আছে যে তিনি অনশনে থেকে অনেকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেমন করতে পারেন তেমনই এতে তাঁর আত্মশুদ্ধিও হয়। গান্ধীজীর দৈহিক স্বাস্থ্য যেমনই হোক, তাঁর মানসিক শক্তির তুলনা মেলে না। এই বৃদ্ধ বয়সেও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের

প্রথম দিকে কারারুদ্ধ গান্ধীজী সুদীর্ঘ একুশ দিন অনশনে কাটিয়েছিলেন। ৭৫ বৎসর বয়স্ক এই বৃদ্ধের অপূর্ব্ব জীবনী-শক্তি এবং ইচ্ছা-শক্তি দেখে তাঁর পার্শ্ববর্ত্তী ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেছিলেন।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ গান্ধীজী রাজনৈতিক কাজ ছেড়ে তাঁর প্রিয় পল্লী-সংস্কার এবং অর্থনৈতিক উন্নতি-বিধানে মনোনিবেশ করেছেন। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যপদেও ইস্তফা দিয়েছেন। কিন্তু দিলে কি হয়, ভারতীয় কংগ্রেস এবং জনসাধারণ তাঁকে ছাড়ে নি। আর জাতির জীবনের কোন বিপদ বা প্রয়োজনে যখনই গান্ধীজীর আহ্বান এসেছে তখনই তিনি অন্য সব সংকল্প ভুলে এগিয়ে এসেছেন দেশসেবার সহজাত আগ্রহে। বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকেই ব্রিটিশদের যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য চল্‌ছিল। ইতিপূর্ব্বে অবশ্য কয়েক বছর কংগ্রেস গান্ধীজীর অনুমতিক্রমেই প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন ক'রে দেশের সেবা করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু প্রথম বিরোধ বাধ্‌ল যুদ্ধ সুরু হবার পর। ব্রিটিশরা গাল ভ'রে বলে যে তারা পৃথিবীর গণতন্ত্র এবং মানব-স্বাধীনতা রক্ষার জন্যেই নাকি জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাই যদি হয়, তবে ভারতবর্ষ কবে স্বাধীনতা পাবে? কংগ্রেসের এই ন্যায়সঙ্গত প্রশ্নের কোন সদুত্তর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দিতে পারেন নি। তাঁরা জোর করে সাময়িকভাবে ভারতের স্বাধীনতাস্পৃহাকে দমিয়ে রেখেছেন বটে. তবে তাতে

সমস্যার সমাধান হয় নি। ভারতীয় জনমতকে বিশেষ ক'রে জাতীয় কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করার জন্যে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মে মাসে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌সের মারফৎ ভারতের জন্যে একটি নতুন রাজনৈতিক প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাবে ভারতীয়দের স্বাধীনতাস্পৃহা যথেষ্ট মিটবে না ব'লে গান্ধীজী তথা কংগ্রেস ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। এর প্রায় মাস তিন চারেক পরে ১৯৪২ এর ৮ই আগষ্ট মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে না দিলে, আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করা হবে। এই ঘোষণা প্রচারিত হ'তে না হ'তেই মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা ধৃত হ'য়ে কারাগারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে প্রেরিত হলেন। কংগ্রেস নেতাদের এই আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে সারা ভারতব্যাপী যে বিপুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন হয়েছিল সে কথা সবাই জানে। পুণার আগা খাঁ প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধীকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। আগা খাঁ প্রাসাদের একটি করুণ স্মৃতি চিরকাল গান্ধীজীর জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় পুণার আগা খাঁ প্রাসাদে গান্ধীজী তাঁর প্রিয়তমা পত্নী শ্রীযুক্তা কস্তুরবা গান্ধীকে হারান। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস থেকেই গান্ধীজী এবং তাঁহার পত্নী পুণার আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী

ছিলেন। বহুদিন থেকেই শ্রীযুক্তা গান্ধী হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। দেশবাসীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট তাঁকে মুক্তি দেন নি। মুক্তি পেলে এত শীঘ্র তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত নাও হ'তে পারত। যাই হোক্, শ্রীযুক্তা গান্ধীর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ যেমন একজন একনিষ্ঠা স্বদেশসেবিকা এবং আদর্শ নারী হারাল, তেমনই গান্ধীজীও হারালেন তাঁর আজন্মের সহচরী এবং কর্ম্মসঙ্গিনী। পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুতে মহাত্মা গান্ধী বৃদ্ধ বয়সে যে অপরিসীম শোক পেয়েছেন, দুর্ব্বলচরিত্র কোন লোকের পক্ষে সে আঘাত সহ্য করা কঠিন হ'ত। কিন্তু ভগবদ্‌-বিশ্বাসী দৃঢ়সংকল্প গান্ধীর চরিত্র অন্য ধাতুতে গড়া। নিজের সুবিপুল মানসিক বিশ্বাসের এবং শক্তির সাহায্যে তিনি এ আঘাতের তীব্রতা অতিক্রম ক'রে যেতে পারবেন। ভারতবর্ষের মুক্তি গান্ধীজীর আজীবনের সাধনা। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে গান্ধীজী কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে তিনি তাঁর আজীবনের প্রিয় গঠনমূলক কার্যে পুনরায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ ক'রে স্বদেশের স্বাধীনতা দেখে যান ভারতবাসী মাত্রই এই কামনা করে।

কামাল আতাতুর্ক্

বিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন রাষ্ট্রনেতা অতি সামান্য অবস্থা থেকে দেশের এবং দশের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নব্য তুরস্কের স্রষ্টা তুর্কী বীর কামাল আতাতুর্ক্ তাঁদের অন্যতম। আমাদের দেশে তিনি সাধারণত কামাল পাশা নামেই পরিচিত। পাশা উপাধিটি তুরস্কের সুলতানের আমলে নাম-করা সেনাপতিদের দেওয়া হত। সুলতানকে নির্বাসিত করে কামাল যখন তুরস্কে সাধারণতন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন, তখন পাশা উপাধিটি গণতন্ত্র-বিরোধী বলে পরিত্যাগ করেছিলেন। তাঁর আর একটি উপাধি ছিল গাজী। গাজী কথাটির মানে ত্রাণকর্তা। গ্রীকদের হাত থেকে তুরস্ককে মুক্ত করার পর, কামাল দেশবাসীদের কাছ থেকে এই গাজী উপাধিটি পেয়েছিলেন। 'আতাতুর্ক্' কথাটির মানে 'তুর্কীদের জনক'। একদিক থেকে বিচার করতে গেলে কামালের এ উপাধির চেয়ে সার্থকতর কোন উপাধি হতে পারে না। সত্যিই তিনিই আধুনিক তুরস্কের জন্মদাতা— অশিক্ষিত দরিদ্র দেশ তুরস্ককে তিনি নিজের প্রচেষ্টায় ঢেলে গড়েছিলেন, তাকে সভ্য সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। তুরস্ক ছিল রক্ষণশীল মুসলমান রাষ্ট্র —একে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সাহায্যে গড়ে তুলতে কামালকে যে বেগ পেতে হয়েছিল তা কল্পনা করা যায় না। তবে নিজের দৃঢ় ইচ্ছা এবং আন্তরিক আগ্রহের বলে তিনি

কামাল আতাতুর্ক

তা সম্ভব করে তুলেছিলেন। তিনি মাত্র ১৫ বৎসর তুরস্কে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব করতে পেরেছিলেন। এরই মধ্যে তিনি তুরস্ককে এমনভাবে গড়ে গেছেন যে নব্য তুরস্ক ক্ষুদ্র হলেও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কামাল আতাতুর্কের জীবনী অত্যন্ত রোমাঞ্চকর—ঠিক রূপকথার মতই চমকপ্রদ এবং বৈচিত্র্যময়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের অন্তর্গত স্যালোনিকা নামে ক্ষুদ্র বন্দরে কামাল আতাতুর্ক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম কামাল নয়— তাঁর পিতা মাতার দেওয়া নাম ছিল মুস্তাফা। তিনি যখন বড় হয়ে সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, তখন ক্যাপ্টেন মুস্তাফা নামে তাঁর একজন শিক্ষক ছিল। যাতে গুরু শিষ্যের নাম নিয়ে গণ্ডগোল না বাধে, সেই জন্যে তিনি ছাত্রের নাম দিয়েছিলেন কামাল। পরে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন। কামালের পিতার নাম ছিল আলী রেজা আর তাঁর মাতার নাম ছিল জুবেদা। তাঁর পিতা নামে সরকারী চাকুরে হলেও তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। পরে তিনি সরকারী চাকুরী ছেড়ে কাঠের ব্যবসায় সুরু করেছিলেন— তাতেও বিশেষ সুবিধা হয় নি। পিতার ইচ্ছা ছিল কামাল বড় হয়ে ব্যবসায়ী হবে আর মাতার ইচ্ছা ছিল সে হবে ধর্মগুরু। পরজীবনে কামাল পিতা মাতা কারুর ইচ্ছাই পূরণ করেন নি। তাঁর মাতা তৎকালীন তুর্কী সমাজের নিয়মানুসারে পর্দানসীনা ছিলেন—শিক্ষা দীক্ষা তাঁর কিছুই ছিল না। তবে নিজের চরিত্রগুণে পরিবারের সবাই তাঁকে মানতে

বাধ্য হত। ছোট বয়েস থেকেই কামাল ছিলেন দুর্দান্ত, দুর্বিনীত। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন গম্ভীর নীরব প্রকৃতির এবং একগুঁয়ে। বাবা বেঁচে থাকতে তিনি কিছু-কাল স্কুলে পড়াশুনো করেছিলেন। এমন সময় পিতৃবিয়োগের ফলে তাঁর পরিবার অকূল সমুদ্রে পড়ে যায়। দরিদ্র আলী রেজা কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। কামালের মা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্যালোনিকার কিছু দূরে তাঁর ভাইয়ের আশ্রয়ে গিয়ে থাকেন। দুরন্ত কামালকে আস্তাবল পরিষ্কার করা, গরু বাছুরকে খাওয়ানো, ভেড়া চরানো প্রভৃতি কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মার একান্ত ইচ্ছা ছেলে লেখাপড়া শেখে। তাই তিনি তাঁর এক বোনকে ধরে কামালের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে রাজী করান। কামাল আবার স্যালোনিকার একটি স্কুলে ফিরে যান। কিন্তু পড়াশুনোর দিকে তাঁর মন ছিল না—সহপাঠিদের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি মারামারি করাই ছিল তাঁর কাজ। একদিন এই অপরাধে শিক্ষকের কাছে ভীষণ মার খেয়ে তিনি স্কুল ছেড়ে চলে আসেন। তিনি আর স্কুলে ফিরে যেতে রাজী হন না। তখন তাঁর মামা তাঁকে সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেবার উপদেশ দেন। সরকারী খরচে পড়তেও পারবে—পাশ করে যদি বেরিয়ে আসতে পারে তবে ভবিষ্যতে চাকরীও সুনিশ্চিত। জুবেদার আদৌ মত ছিল না। কিন্তু কামাল নিজে মনস্থির করে ফেলেছিলেন—তিনি সৈন্যই হবেন। তাঁর মনে স্বপ্ন ছিল—একদিন তিনি ইউনিফর্ম

পরবেন, অফিসার হবেন, সৈন্যরা তাঁর আদেশ পালন করবে।

কামালের বয়েস তখন বছর তেরো। তিনি স্যালোনিকার সামরিক স্কুলে শিক্ষার্থী হয়ে গেলেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি ভালভাবে পাশ করে মনাষ্টির সহরে উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ে গেলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ—এশিয়া এবং ইউরোপে তখনও তুরস্কের বিরাট সাম্রাজ্য। তুরস্কের সম্রাট তখন সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ। কিন্তু সে সময় তুরস্ক সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরা সুরু করেছে। শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল দুর্নীতি এবং অযোগ্যতা। সুলতান আব্দুল হামিদ যেমন বিদেশীদের ভয় করতেন, তেমনই নিজের প্রজাদেরও সন্দেহের চোখে দেখতেন। তরুণ তুর্কীদের মধ্যে তখন দারুণ অসন্তোষ—তারা চাইছিল শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন। কামাল মনাষ্টিরে এসে সে আভাস পেলেন। ক্রীটের ব্যাপার নিয়ে তুরস্কের বিরুদ্ধে তখন গ্রীস বিপ্লব ঘোষণা করেছে। তরুণ তুর্কীদের মধ্যে যেমন অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল, তেমনই তাদের দমনের জন্যে সুলতান সমস্ত দেশ গুপ্তচরে ছেয়ে ফেলেছিলেন। তবু লুকিয়ে লুকিয়ে যুবক যুবতীরা অনেক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। এই বিপ্লবের আবহাওয়ায় এসে কামালের ভালই লাগল। তিনি ছিলেন জন্ম-বিপ্লবী। এই সময় তিনি খৃষ্টান ধর্মযাজকের কাছ থেকে ফরাসীভাষা শেখেন এবং রুশো, ভলটেয়ার প্রভৃতি বিপ্লবী ফরাসী লেখকদের বই ও হব্‌স, জন ষ্টুয়ার্ট মিল

প্রভৃতি ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্‌দের বই পড়ে ফেলেন। তুর্কী সাম্রাজ্যে তখন এ সব পুস্তক পাঠ ছিল নিষিদ্ধ। এই সময় তিনি রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করেন—এবং জ্বালাময় রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও কবিতা লেখাও সুরু করেন। মনাস্টির থেকে পাশ করে তিনি সাব-লেপ্টেনাণ্ট রূপে কনস্টান্টিনোপ্‌লের্‌ জেনারেল স্টাফ কলেজে যোগ দেন।

জেনারেল স্টাফ কলেজ থেকে তিনি সসম্মানে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। তিনি তখন গোপনে গোপনে পুরোদস্তুর বিপ্লবী—সুলতানের অত্যাচার থেকে তুরস্ককে রক্ষা করতে হবে—তুরস্কের উপর থেকে বিদেশী শক্তির প্রভাব খর্ব করতে হবে—এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তরুণ অফিসারদের মধ্যে তাঁর মত অনেক বিপ্লবী ছিলেন। তাঁদের একটি গোপন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ছিল। কামাল এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। একদিন তিনি এবং আর কয়েকজন সদস্য সরকারী গুপ্তচরদের হাতে ধরা পড়েন—তার পরেই কারাবাস। ইস্তাম্বুলের 'রেড প্রিজন' নামে প্রসিদ্ধ কারাগারে একটি কক্ষে তাঁকে একা আটক রাখা হল। তাঁর অপরাধ গুরুতর—রাজদ্রোহ। কামালের চোখে ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে মনে হল। কিন্তু সামরিক শিক্ষা বিভাগের বড়কর্তা ইস্‌মাইল হাকী পাশা তরুণ কামালের কৃতিত্বের পরিচয় পেয়েছিলেন—বুঝেছিলেন যে এই যুবক একদিন বড় সমর-নেতা হতে পারবে। তাই কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন তিনি কামালকে ডেকে

তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়ে তাঁকে, একটি অশ্বারোহী সেনাদলের ভার দিয়ে তুরস্কের সাম্রাজ্য সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে বলে দিলেন যে দ্বিতীয়বার তাঁর নামে রাজদ্রোহের কোন অভিযোগ এলে তাঁর অপরাধ আর মার্জ্জনা করা হবে না।

সিরিয়ায় গিয়েও কামাল দমলেন না—সেখানেও তিনি গোপনে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে লাগলেন এবং প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন স্যালোনিকায় বদলী হতে। স্যালোনিকাতেই তখন বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা ছিল। অবশেষে তিনি স্যালোনিকায় বদলী হলেন এবং এসে দেখলেন যে সেখানে 'কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রোগ্রেস' নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এই কমিটিতে আনওয়ার, জামাল, তালাৎ, নিয়াজী প্রভৃতি কয়েকজন নেতা ছিলেন। এঁদের মতের সঙ্গে কামালের মত মিলত না, তবু তাঁকে সাময়িকভাবে এঁদের সঙ্গেই কাজ করতে হল। তখন ১৯০৮ সাল। হঠাৎ কমিটির প্রচেষ্টায় সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হল। ম্যাসেডোনিয়ার সৈন্যদল বিদ্রোহী হল—কামাল কিন্তু নিষ্ক্রিয় ছিলেন। না ভেবে চিন্তে কোন কাজ করা তাঁর স্বভাব ছিল না। যাই হোক এই বিপ্লবের আংশিক ফল হল। বিদ্রোহীদের শান্ত করার জন্যে সুলতান আব্দুল হামিদ তাঁর মন্ত্রীদের বরখাস্ত করলেন এবং প্রজাদের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে রাজী হলেন। কমিটির জয়জয়কার হল বটে—কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা কমিটির

হাতে এল না। সুতরাং আব্দুল হামিদের দ্বারা নির্ব্বাসিত প্রবীণ রাজনীতিবিদরা বিদেশ থেকে ফিরে এসে কমিটির পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। আনওয়ার, জামাল প্রভৃতিকে বিভিন্ন সরকারী পদ দিয়ে বিদেশে পাঠান হল। তুরস্কের ভিতরের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তুর্কী সাম্রাজ্যে ধরল ভাঙ্গন। রাশিয়ার সাহায্যে বুলগেরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করল, গ্রীস ক্রীট দখল করল, আলবেনিয়া এবং আরবে বিদ্রোহ দেখা দিল। এদিকে সুলতান সমর্থকরা কনস্টান্টিনোপলের সৈন্যদলকে হাত করে কমিটি অব ইউনিয়ন্ এণ্ড প্রোগেসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল—জন-সমাজে তাদের ধর্মবিরোধী বলে প্রচার করে রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দিল। আবার বিপ্লব। বিপ্লবীদের সেনাদল কনস্টান্টিনোপ্‌ল দখল করে সুলতান আব্দুল হামিদকে পদচ্যুত ও বন্দী করে তাঁর পদে তাঁরই এক আত্মীয়কে বসান। এবার আনওয়ার, জামাল এবং তালাৎ—এঁরাই হলেন প্রকৃত শাসনকর্তা। এঁরা কামালের স্বাধীন মতামত ভালবাসতেন না। তাই কামাল আগের মতই রয়ে গেলেন। জেনারেল আলী রিজার ষ্টাফের সঙ্গে তাঁকে ফ্রান্সে পাঠান হল।

কামাল দেখলেন যে বিপ্লবের ফলে তুরস্কের শাসন-অবস্থায় বিশেষ কোন উন্নতি হল না। বিদেশী স্বার্থ তুরস্কের বুকে তেমনিই শিকড় গেড়ে রইল। বিশেষ করে জার্ম্মাণীর প্রভাব তুরস্কে অত্যন্ত বেড়ে গেল। প্রকৃত দেশ-

প্রেমিক কামাল এই বিদেশী প্রভাব দুচোখে দেখতে পারতেন না। অথচ উপায় নেই—তাঁকে সবই মেনে নিতে হয়। তিনি এখন প্রবীণ রাজকর্মচারীদের মধ্যে অন্যতম। সেনানায়করূপে তাঁর খ্যাতি ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি গোপনে গোপনে আবার নতুন শাসকদের বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছিলেন। আনওয়ার, জামাল প্রভৃতি তাঁর মতামত জানতেন। তাই তাঁরা তাঁকে এখানে ওখানে বদলী করতে লাগলেন। কামাল এত সতর্ক ছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছুই প্রমাণ করাও যায় না—অথচ তাঁকে বিশ্বাস করাও চলে না। তাঁর মত একজন নিপুণ অফিসারের মায়াও ত্যাগ করা চলে না। এই সময় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সাম্রাজ্য উত্তর আফ্রিকার ত্রিপোলীতে ইটালী হঠাৎ অভিযান সুরু করল।

যুদ্ধ-প্রিয় কামালের সুযোগ এল। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধ ক্ষেত্রে চলে গেলেন। এক বছর যুদ্ধ করেও ফল হল না। এমন সময় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত বল্কান রাজ্যগুলো একত্রিত হয়ে তুরস্ক আক্রমণ করল। খাস তুরস্কের বিপদ দেখা দেওয়ায় তুর্কী গভর্ণমেণ্ট ইটালীর সঙ্গে সন্ধি করলেন এবং কামালকে স্বদেশে ফিরে যেতে হল। প্রায় দুবৎসর ধরে বল্কান যুদ্ধ চলেছিল। কামাল বল্কান যুদ্ধে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে তুরস্ককে কতকটা অসম্মানজনক সর্তেই সন্ধি করতে হয়েছিল। কিন্তু এ যুদ্ধ থামতে না থামতেই সুরু হল ১৯১৪-১৮র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। যারা একযোগে তুরস্ককে আক্রমণ করেছিল, তাদেরই মধ্যে লাগল [illegible] বিরোধ। এই সুযোগে আনওয়ার

পাশা তুরস্কের হারানো সাম্রাজ্য কিছুটা ফিরিয়ে নিলেন এবং যুদ্ধে জার্মাণ পক্ষে তুরস্ককে নামালেন। জার্মাণ সেনাপতিরা এসে তুর্কী সেনাদলকে গড়ে তুলতে লাগলেন। কামাল তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশীদের হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁর কথা শোনে কে ? তিনি সামান্য একজন সেনা-পতি—আর আনওয়ার তখন সমর-সচিব। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জার্মাণ সেনাপতি লিম্যান ফন্ স্যাণ্ডার্সের অধীনে কামালকে দার্দানেল্স্ প্রণালী রক্ষার জন্যে নিযুক্ত করা হল। ইংরেজরা মিসরে সৈন্য সংস্থান করে দার্দানেল্সের পথে তুরস্কের গ্যালিপলি আক্রমণের চেষ্টা করছিল। জার্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষ স্যাণ্ডার্স এবং কামাল দুজনেই ভীষণ দাম্ভিক প্রকৃতির ছিলেন। অথচ দুজনেই সুনিপুণ রণনীতিবিশারদ ছিলেন। তাই কামালের চরিত্রে সুস্পষ্ট জার্মান-বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও তিনি লিম্যান ফন স্যাণ্ডার্সের অনুরক্ত ছিলেন। কামালের মুখে সাধারণতঃ কারও প্রশংসা শোনা যেত না—অথচ তিনি এই জার্মাণ জেনারেলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেলেন। তাঁর অধীনে কাজ করে তিনি খুশীই ছিলেন। অপরদিকে ফন স্যাণ্ডার্সও কামালের কর্মক্ষমতা এবং বিচার-বুদ্ধির জন্যে তাঁর খুব প্রশংশা করতেন। দার্দানেল্স্ রক্ষায় কামাল অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রায় এক বছর এই যুদ্ধ চলেছিল। একাধিকবার কামালের জীবন বিপন্ন হয়েছিল—কিন্তু তিনি ইংরেজদের হাতে দার্দানেল্স ছেড়ে দেন নি। দার্দানেলস্ ছেড়ে দিলে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন হত এবং সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কেরও

পরাজয় হত। এ যুদ্ধ কামালের জীবনের অন্যতম কীর্তি। এই যুদ্ধবিজয়ের ফলে তিনি 'পাশা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯১৫র ডিসেম্বর মাসে ইংরেজেরা হতাশ হয়ে দার্দানেল্‌স্ বিজয়ের যুদ্ধ ত্যাগ করল—কামাল ফিরে এলেন কনষ্ট্যান্টি-নোপ্‌লে।

কামাল এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। আনওয়ার কার্যত তুরস্কের শাসনকর্তা হলেও, তিনি কামালকে ভয় করতেন। তাঁকে রাজধানী থেকে দূরে সরিয়ে রাখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তাঁকে একটি বাহিনীর অধিনায়ক করে ককেশাসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ককেশাসে তিনি সহকর্মী-রূপে পেয়েছিলেন কর্ণেল ইস্‌মেৎকে (ইনিই বর্তমান তুরস্কের রাষ্ট্রনায়ক ইসমেৎ ইনোনু) এবং জেনারেল কিয়াজিম কারা বেকিরকে। এদের সহায়তায় তিনি সেনাবাহিনীকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। রুশদের আক্রমণের ভয়ে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রুশরা নতুন আক্রমণ করল না। এদিকে সিরিয়ার পথে ইংরেজেরা তুরস্ক আক্রমণের চেষ্টা করছিল। কামালের প্রতি আদেশ এল তাঁকে সিরিয়া রণাঙ্গনে যেতে হবে। তিনি সংবাদ পেয়েই রওনা হয়ে গেলেন। ইংরেজেরা বাগদাদ দখল করে মোসুলের দিকে এগিয়ে আসছিল এবং প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া আক্রমণের জন্যে মিসরে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত করছিল। তাদের থামাতে হবে- [illegible]দ পুনর্দখল করতে হবে এই ছিল তুর্কী কর্তৃপক্ষের [illegible]। [illegible]ই অঞ্চলের তুর্কী [illegible]সৈন্যদের

প্রধান অধিনায়ক ছিলেন জার্মাণ সেনাপতি ফন্ ফকেনহেন্। তাঁর সঙ্গে কামালের মতের মিল হল না। তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশীরা হস্তক্ষেপ করুক—এ কামাল চাইতেন না। তবু লিম্যান ফন্ স্যাণ্ডার্সের রণকুশলতার উপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু ফকেনহেন্‌কে তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। আনওয়ার এদের মতের মিল ঘটানোর যথেষ্ট চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তাই অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে কামালের ছুটি দেওয়া হল। কামাল ফিরে এলেন কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌লে। কিন্তু কামালের মত বিপ্লবীকে বেকার বসিয়ে রাখা যে কি বিপদের ব্যাপার আনওয়ার তাও জানতেন। তাই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তুরস্কের যুবরাজ প্রিন্স্ ভাহেউদ্দিন যখন জার্মাণী পরিদর্শনে গেলেন, তখন তাঁরই সঙ্গে কামালকেও অন্যতম রাজকর্মচারী-রূপে পাঠানো হল।

অলক্ষিতে কামালের জীবনে একটা সুযোগ জুটে গেল। তিনি জানতেন যে ভাহেউদ্দিনই একদিন তুরস্কের সুলতান হবেন। তাঁকে যদি কামাল হাত করতে পারেন, তবে জার্মাণ-দের তাঁবেদার আনওয়ার গভর্ণমেণ্টকে তাড়ানো যাবে। তিনি যুবরাজকে বোঝালেন যে এযুদ্ধে জার্মাণী পরাজিত হবে অতএব আগে থেকেই ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার সঙ্গে সন্ধি করা ভাল। তা নইলে যুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের দুর্দ্দশার অন্ত থাকবে না। জার্মাণী যাত্রার প[illegible] এবং জার্মাণী থেকে ফেরার পথে কামাল যুবরাজকে অনেক মন্ত্রণা দি[illegible] গেল[illegible] তাঁরা ফিরে আসার পর [illegible] মাসে অকস্মাৎ সুলত[illegible] [illegible]্যতে প্রিন্স ভাহে-

উদ্দিনই সুলতান হলেন। কিন্তু কামালের কোন ভাগ্যোন্নতি হল না—কিংবা তুরস্কের যুদ্ধও থামল না। আনওয়ার পাশা পূর্বের মতই নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখলেন। কামালকে আবার সিরিয়ার রণাঙ্গনে পাঠানো হল। সিরিয়ায় তখন কার্যত কোন তুর্কী সৈন্যদল ছিল না বললেই চলে। কোন রকমে লিম্যান ফন্ স্যাণ্ডার্সের সহায়তায় কামাল অগ্রসরমাণ ইংরেজ-বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে লাগলেন। জার্মাণী এবং তুরস্ক যে এ যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না—কামাল তা বহুদিন আগেই জানতেন। কিন্তু তাঁর কথায় কান দেয় কে? ইতিমধ্যে কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌ল থেকে খবর এল যে আনওয়ার জামাল, তালাৎ প্রভৃতি সুলতানের মন্ত্রীরা তুরস্ক থেকে পালিয়েছেন—আর জেনারেল ফভ্‌জি, ক্যাপ্টেন রউফ্ প্রভৃতিকে নিয়ে নতুন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। কামাল এবারও বাদ পড়লেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর এই নতুন গভর্ণমেণ্ট ইংরেজদের সঙ্গে ভিন্ন সন্ধি করলেন। সমস্ত জার্মাণের স্বদেশে ফিরে যাবার আদেশ এল। বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে লিম্যান ফন্ স্যাণ্ডার্স কামালের করমর্দন করে তাঁকে জানিয়ে গেলেন যে তাঁর মত সুনিপুণ তুর্কী সেনাপতি তিনি আর দুজন দেখেন নি। কামালের প্রতি আদেশ এল ইংরেজদের হাতে সব অস্ত্রশস্ত্র দিতে হবে—কামাল সে আদেশ মানলেন না। বিদেশীদের প্রভাব কামাল সইতে পারতেন না—তা সে জার্মান [illegible] ক আর ইংরেজই হোক। এদিকে প্রধান মন্ত্রী [illegible] পাশা [illegible] সুলতানের মতবিরোধ হয়েছিল। ইজ্জৎ [illegible] করে [illegible] ন পদত্যাগ [illegible] বন—তাঁর

স্থানে প্রধান মন্ত্রী হবেন ইংরেজদের সমর্থক টৌফিক পাশা। ইজ্জৎ কামালকে কনষ্ট্যান্টিনোপলে ফিরে আসার জন্য টেলিগ্রাম করলেন। কামাল ফিরে এলেন।

তিনি নবেম্বরের শেষে রাজধানীতে ফিরে এলেন। যুদ্ধ-বিরাতর পর একমাস চ'লে গেছে। তিনি এসে দেখলেন যে ইংরেজ সৈন্যেরা সব কিছু দখল করে বসে আছে। বস্‌ফোরাসে ইংরেজ জাহাজ, রাজধানী ইংরেজদের হাতে—দার্দানেল্‌সের দুর্গগুলোও তাদের হাতে। স্বদেশের এই দুরবস্থা দেখে কামাল ব্যথিত হলেন। তুর্কী সাম্রাজ্যের তো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না—মিসর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আরব সব গেছে—এখন খাস তুরস্কও বিদেশী ইংরেজদের হাতে। দুর্বল টৌফিক পাশার গভর্ণমেণ্ট ইংরেজদের সব আদেশ পালন করে চলেছিল। কামাল স্থির সংকল্প করলেন যে বিদেশীদের হাত থেকে তুরস্ককে বাঁচতে হবে। তিনি কনষ্ট্যান্টিনোপলে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। ২।১জন তাঁর কথায় কান দিলেও কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে না। স্বয়ং সুলতান ভাহেউদ্দিনের সঙ্গে তিনি দেখা করলেন। তিনিও তাঁর কথায় কান দিলেন না। সবাই যেন ইংরেজের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে ভালবাসে। এদিকে ধীরে ধীরে ঘটনা-স্রোতের গতি ফিরছিল। ধীরে ধীরে তুরস্কের বুক থেকে ইংরেজদের বজ্রমুষ্টি শিথিল [illegible] আসছিল। ১৯১৯ সাল এসে গেল। মহাযুদ্ধ শেষ [illegible] গেছে [illegible]টিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড [illegible] তখন [illegible]ত্তর [illegible] বিধি-ব্যবস্থা

নিয়ে ব্যস্ত। তিনি বললেন যে তুরস্ককে ছেড়ে দেও—ক্ষুদ্র তুরস্ক নিজের থেকেই ভেঙ্গে যাবে। রাজধানী ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ইংরেজদের প্রভাব যতই থাক, তুরস্কের মধ্যাঞ্চলে—বিশেষ করে আনাতোলিয়া অঞ্চলে—ক্রমে ক্রমে ইংরেজ-বিরোধিতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। সৈন্যদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ইংরেজদের হাতে তুলে দেবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তারা তা দেয় নি—গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা হচ্ছিল। সুলতানের মন্ত্রি-মণ্ডলে যারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই কামালের বন্ধু এবং স্বদেশপ্রেমিক। ইসমেৎ, ফেভ্‌জী, ফেঠি—এঁরা এই সব ইংরেজ-বিরোধী কার্য্যকলাপ দেখেও দেখছিলেন না। কামাল নতুন করে গোপন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গঠনে অগ্রসর হলেন। কামালের জীবনে ভাগ্যের খেলা বহু দেখা গেছে। ভাগ্যের জোরে তিনি রণাঙ্গনে বহুবার মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছেন—ভাগ্যই তাঁকে বড় করে তুলে ধরেছিল। অবশ্য সুযোগ এলেই সকলের তা গ্রহণ করার মত ক্ষমতা থাকে না। কামালের সেই দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে সুলতানের কথাবার্তার পর স্থির হল যে আনাতোলিয়ায় যে ইংরেজ-বিরোধের বীজ দেখা যাচ্ছে, তাকে অবিলম্বে ধ্বংস করতে হবে। সে সময় তুরস্কের পথ ঘাট ভাল ছিল না—যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। সুলতান স্থির করলেন কামালকেই একাজে পাঠাবেন। ইং[illegible] এতে আপত্তি ছিল। তবু শেষ পর্য্যন্ত সুল[illegible]ন ইচ্ছা[illegible]। কামাল ইংরেজ বিরোধী বিপ্লব [illegible]ন্যে [illegible]ের [illegible]নারেল ও

পশ্চিমাঞ্চলের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল রূপে আনাতোলিয়ায় গেলেন। কামালের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজনা হল।

কোথায় বিপ্লব দমন করবেন—তিনি নতুন করে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে লাগলেন। তিনি জানতেন যে ইংরেজের বিরোধিতা করতে গেলে তুর্কী জনসাধারণ তাঁকে সহায়তা করবে—কিন্তু সুলতানের উপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। একে তো তিনি সুলতান তার উপর তিনি সমগ্র তুর্কী মুসলমানদের ধর্মগুরু—খলিফা। কাজেই কামাল সাবধানে কাজে হাত দিলেন। তিনি জনসাধারণকে বোঝালেন যে বিদেশী ইংরেজ-দের হাতে সুলতান সম্পূর্ণ নিরুপায়। কাজেই তিনি তাঁকে প্রতিনিধি মনোনীত করে পাঠিয়েছেন—ইংরেজদের হাত থেকে তুরস্ককে বাঁচতে হবে—সুলতানকে উদ্ধার করতে হবে। ধর্ম্মভীরু কুসংস্কারাচ্ছন্ন তুর্কীদের স্বরূপ কামাল জানতেন। তাঁর মনে মনে বিপ্লবী পরিকল্পনা ছিল যে তুরস্কের বুক থেকে সুলতান পদ উঠিয়ে দিতে হবে, তুরস্ককে একটি সাধারণতন্ত্রে পরিণত করে তাকে নতুন ভাবধারায় গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এত শীঘ্র সে সব কথা বলতে গেলে তাঁর সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে—তিনি সৈন্যদল কিংবা জনসাধারণ কারও সাহায্য পাবেন না। তাই কামাল ধীর মস্তিষ্কে কাজে হাত দিলেন। তিনি সৈন্যদলকে হাত কর' [illegible] সিভাসে জনসাধারণের একটি কংগ্রেস আহ্বান করে [illegible] স্বাধীন [illegible] স্কের একটি কমিটি গড়ে তুল [illegible] নিজে [illegible] ন [illegible] ির প্রেসিডেন্ট।

তিনি নিজে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সুপ্ত গ্রামবাসীদের জাগিয়ে তুলতে লাগলেন—তাদের বোঝালেন যে বিদেশীদের হাতে তাদের প্রিয় তুরস্ক আজ বিপন্ন। তারা সাড়া দিল। এদিকে কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌লে সুলতানের কানে এসব কথা পৌঁছলো। তিনি গ্রেপ্তার করার আদেশ দিলেন—সৈন্যরা তাঁর কথা শুনল না। তিনি কামালকে নানা ভাবে জব্দ করার প্রয়াস পেলেন—কিন্তু সব বিফল হল। কামালের চতুর্দিকে এসে জাতীয়তাবাদী তুর্কী নেতারা ভীড় করে দাঁড়ালেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তুর্কী পার্লামেণ্টে যে নতুন নির্বাচন হল, তাতে কামালের দল বহু সংখ্যায় নির্বাচিত হলেন। কি কি সর্তে তুরস্ক ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে, সে সম্বন্ধে একটি জাতীয় চুক্তি প্রস্তুত করা হয়েছিল। নব নির্বাচিত কামালের দলের ডেপুটিরা স্থির করলেন যে তাঁরা কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌লের পার্লামেণ্ট অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং জাতীয় চুক্তি সাধারণ্যে প্রকাশ করবেন। সুলতান তাঁদের পার্লামেণ্টে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কামাল জানতেন যে এতে কোন ফল হবে না। তাই তিনি তাঁদের প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন—কিন্তু পারলেন না। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারী পার্লামেণ্টের অধিবেশন হল। জাতীয়তাবাদী ডেপুটিরা জাতীয় চুক্তি ঘোষণা করলেন। ফলে ইংরেজদের হাতে অনেক ডেপুটি ধরা পড়লেন—অনেকে পালিয়ে এলেন আনাতোলিয়ায়। [illegible] উফ্ প্রভৃতি অনেক জাতীয়তাবাদী তুর্কী [illegible]দিকে ই[illegible] মাল্টায় বন্দী করে রাখলো। সুলতা[illegible] [illegible]চর[illegible] ধারণের [illegible] প্রবল

বিক্ষোভ দেখা দিল—কামালের জনপ্রিয়তা গেল আরও বেড়ে। ২৩শে এপ্রিল কামালের নেতৃত্বে আন্কারা বা অ্যাঙ্গোরায় গ্রাণ্ড ন্যাশান্যাল এসেম্বলীর অধিবেশন হল। এই আন্কারাই বর্তমানে তুরস্কের রাজধানী। সেখানে স্থির হল যে তুরস্ক সম্পূর্ণ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত, জাতীয় চুক্তি মেনে না লওয়া পর্য্যন্ত, তুরস্কে যুদ্ধের বিরাম হবে না। তুর্কী জাতীয়তাবাদীদের এই মতিগতি দেখে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা ঘাবড়ে গেল। অথচ তুরস্কের দিকে নজর দেবার সময় তাদের নেই। তাই তারা গ্রীকদের উপর ভার দিল তুরস্ককে সায়েস্তা করার। গ্রীকরা স্মার্ণা আক্রমণ করল এবং তুরস্কের অনেক জায়গা দখল করে নিল। কামাল কিন্তু বসে ছিলেন না। তাঁর নিজের দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তিনি কঠোর হস্তে সে সব দমন করলেন—তুর্কী বাহিনীকে গড়ে তুললেন। ধীরে ধীরে তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে লাগলেন। ১৯২১-এর জানুয়ারী মাসে তাঁর অন্যতম সেনাপতি ইসমেৎ ইনোনু নামক স্থানে যুদ্ধে গ্রীকদের পরাজিত করলেন। এই ইসমেৎই পরে ইসমেৎ ইনোনু নাম নেন এবং কামালের মৃত্যুর পর ইনিই বর্তমানে স্বাধীন তুরস্কের রাষ্ট্রনায়ক। এর পর গ্রীকরা আবার বড় রকমের আক্রমণ করল। গ্রীকদের সৈন্য ছিল সুশিক্ষিত এবং তাদের সংখ্যাও ছিল বেশী। তারা বেশ কিছু দূর এগিয়ে এসে

এই স[illegible] কামাল [illegible] সনাপ[illegible] [illegible]র্য্যভার গ্রহণ করেন এবং [illegible] [illegible]রস্কের [illegible]য়ক [illegible]ান। ১৯২২-এর

২৬শে আগষ্ট তিনি গ্রীকদের আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন এবং ৯ই সেপ্টেম্বর তুর্কীরা স্মার্ণা পুনরধিকার করে। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে গ্রীকরা স্বদেশে ফিরে যায়। ১৯২২-এর ১লা নবেম্বর কামাল তুরস্কের সুলতান পদ লুপ্ত করে দেন। তাঁকে শুধু ধর্মগুরু বা খলিফা হিসাবে রেখে দেওয়া হয়। ১৯২৩-এর জুলাই মাসে লৌসেনে কামাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিত্রশক্তির চুক্তি হয়—সমস্ত বিদেশী সৈন্য তুরস্ক ছেড়ে চলে যায়। তুরস্ক স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায়—কামালের জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। আন্‌কারা বা অ্যাঙ্গোরাতে তুরস্কের রাজধানী করা হয়। তুরস্ক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়। কামাল হলেন তুরস্কের প্রথম প্রেসিডেণ্ট, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ কামাল খলিফার পদ তুলে দেন—তুরস্কের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ থাকবে না—এই ছিল তাঁর অভিমত। খলিফার গুপ্তচরদের প্রবর্তনায় কোথাও কোথাও বিপ্লব দেখা দেয়। কামাল কঠোর হস্তে সে সব দমন করেন। তিনি পুরাতন তুরস্ককে নতুন করে গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেন। তুরস্ককে বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সভ্য রাষ্ট্রে পরিণত করবেন—এই ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা এবং তাঁর সে চেষ্টা সফলও হয়েছিল। কামালের ধর্মবিরোধী কার্য্য-কলাপের জন্যে তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে একাধিক ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তিনি কঠোর শাস্তি তাঁর বিরোধী দলকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। বুঝেছি তুরস্কের সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ জনগণকে থে চ রতে হ জোর

করেই তাদের সে পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে। যদি কামালের বিরোধী কোন দল থাকে, তবে তাঁর সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। কার্যত হয়েছিলও তাই। তিনি বারদুয়েক শাসনরজ্জু কিছুটা আলগা করে জনসাধারণকে কিছু পরিমাণে স্বাধীনতা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত—প্রগতি-বিরোধী নেতাদের প্ররোচনায় দু-দুবার বিদ্রোহর আগুন জ্বলে উঠেছিল। কামাল দুবারই কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। তুর্কী জাতির উপর কামালের ছিল অগাধ বিশ্বাস। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা পেলে তাঁর জাতি একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হবে। তিনি একবার বলেছিলেনঃ "আমি সমস্ত জাতিকে চিনি, আমি তাদের দেখেছি রণাঙ্গনে, দেখেছি যুদ্ধের আগুনের মধ্যে, দেখেছি মৃত্যুর মুখোমুখী যখন জাতির চরিত্র নগ্নভাবে চোখের সামনে ধরা দেয়। হে আমার জাতি আমি তোমাদের কাছে শপথ করে বলছি যে আমাদের জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি পৃথিবীর সকলের চেয়ে বেশী।...

"আমার জাতি ঠিকভাবে চলতে না শেখা পর্যন্ত এবং পথ না চেনা পর্যন্ত আমি তাদের হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। তখন তারা নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারবে, নিজেরাই নিজেদের শাসন করতে পারবে। তখন আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে।"

বোধ হয় এই কাজ [illegible] করার [illegible]ই ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই [illegible] কামাল [illegible]র্কের [illegible]ন। তবু সামান্য

কয়েক বৎসরের মধ্যে তুর্কী জাতিকে তিনি যেভাবে গড়ে রেখে গেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। আজীবন কামালের স্বাস্থ্য কখনই ভাল ছিল না। তবে কামালের ইচ্ছা-শক্তি ছিল দুর্জ্জয়। অসুস্থ দেহ নিয়ে মাত্র ৫৭ বৎসরের জীবনে তিনি যে কীর্তি রেখে গেছেন ইতিহাসে তার তুলনা কমই মেলে। তিনি তিনবার তুরস্কের সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। গৃহের বিশৃঙ্খলা দূর করেই তিনি জাতীয় সংস্কারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। তুর্কী জাতিকে তিনি সুসভ্য আধুনিক করে তুলবেন—এই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। তিনি রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার —আর রাজনীতি সমস্ত সমাজের ব্যাপার। তিনি জাতিকে ফেজ্ টুপি ছাড়িয়ে ইউরোপীয় হ্যাট পরাতে বাধ্য করেছিলেন। কামাল আইন করে দিলেন যে তুর্কীদের পক্ষে ফেজ্ পরা চলবে না। কোন কোন জায়গায় তুর্কীরা এই আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়াস পেল—তিনি কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করলেন। সবাই হ্যাট পরতে বাধ্য হল। তিনি নিজে সাহেবী পোষাক পরে সারা দেশময় প্রচার করতে লাগলেন যে ফেজ্ হচ্ছে নিবুদ্ধিতার চিহ্ন—সভ্য হতে হলে ফেজ্ বর্জ্জন করতে হবে। জার্মাণ, ইতালীয় এবং সুইটজার্লাণ্ডের আইনের আদর্শে তিনি নিজের দেশের আইনকে ভেঙ্গে গড়লেন—কারও প্রতিবা[illegible] করলেন না। সমগ্র দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা [illegible] ক [illegible] গলেন- [illegible]রখা পরে পথে বেরুনো [illegible] াঙ্গে [illegible] হল। তিনি

জাতিকে গড়ে তুলতে নজর দিলেন শিক্ষার দিকে। সেখানে দেখলেন মস্ত অসুবিধা আরবী বর্ণমালা। আরবী বর্ণমালার সাহাযে ভাষা শিক্ষা যে কত কঠিন ব্যাপার কামাল নিজে তা বেশ জানতেন। তাই সাধারণ লোকের পক্ষে লেখাপড়া শেখা সম্ভব হয় না। সাধারণ লোকেরাও যাতে অনায়াসে লেখাপড়া শিখতে পারে, সে জন্যে কামাল তুর্কী ভাষায় লাটিন বর্ণমালার প্রবর্তন করলেন। তুরস্কে বহু নতুন স্কুল স্থাপিত হল! কামাল নিজে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে নতুন বর্ণমালার প্রচার করতে লাগলেন।

কামালের প্রচেষ্টায় পুরাতন তুরস্ক নতুন প্রাণস্পন্দন নিয়ে জেগে উঠল—খেলাধূলো হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে তুর্কী জাতি দুনিয়ার সভ্য জাতিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে দাঁড়াল। তুরস্কের সমাজজীবনে এবং রাজনীতিতে কামাল আরও বহু পরিবর্তন এনেছিলেন। মাত্র একটি ছোট প্রবন্ধে সব পরিবর্তনের কথা আলোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি আজীবন তাঁর জাতির উজ্জ্বল ভবিষৎ সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখতেন, ক্ষমতা পেয়ে তিনি সেই স্বপ্নকেই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। এইখানেই কামালের মহত্ত্ব—এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি বড় সেনাপতি ছিলেন সন্দেহ নেই—সবার উপর তিনি ছিলেন বড় জাতি-সংগঠক। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁর 'আতাতুর্ক' বা তুর্কী [illegible]তা' উপাধিকে সার্থক বলেই স্বীকার কর[illegible] হয়।